নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

সৈয়দ আতিকুর রহমান

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যান+এডিটঃ আদনান আহমেদ রিজন
স্ক্যানের জন্যে বইটি দিয়েছেনঃ নাজিরুল বশির

পিডিএফ তৈরী করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে, যেন সবাই সহজেই বই পেতে,পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।
বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি সংগ্রহ করুন। লেখক/প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন, তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল ।

হ্যাপি রিডিং... :)

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

সৈয়দ আতিকুর রহমান

অবসর

প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯০
দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অবসর প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ বিদেশী শিল্পীর চিত্র 'যুবক নেপোলিয়ন' অবলম্বনে

মূল্য ৫৫.০০ টাকা মাত্র

NAPOLEON BONAPARTE A biography by Sayed Atiqur Rahman
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road Sutrapur, Dhaka-1100
Second Edition Feb. 1998 Price Taka 55.00 Only

একমাত্র পরিবেশক প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

উ ৎ স র্গ

রফিকুল আলমের
স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে ফরাসি বিপ্লব বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়। বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে এই বিপ্লব। আর এর ঘটনাপ্রবাহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে 'বিপ্লবের সন্তান' হিসেবে। অথচ তার আগমনের বহু পূর্বেই গোটা ফ্রান্সে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সেই বিপ্লব। একজন সৈনিক হয়েও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার জন্য সে হয়েছে বিতর্কিত। কিন্তু এটা অজানা নয় যে, এই বিপ্লবকে মূলধন করেই ফরাসি তথা ইউরোপের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবেশ করেছিল নেপোলিয়ন। কারণ, তৎকালীন ফ্রান্সের দুর্দশাগ্রস্ত, ক্লিষ্ট, শীর্ণ ফরাসিদের শাসনক্ষেত্রে সংস্কার চেয়েছিল সে। চেয়েছিল উপযুক্ত শাসননীতি দিয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচার, অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে। বিপ্লবোত্তর ফরাসিকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে। তাদের জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তুলতে। চেয়েছিল তাদেরকে বোঝাতে—শাসনের নামে কত অন্যায়, কত অত্যাচার, বিচারের নামে কী অবিচার! রাজার দণ্ড কী নিপীড়ন বয়ে আনে অজ্ঞ, মূর্খ ও সাধারণ প্রজাদের ওপর। যুগ যুগ ধরে তাদেরই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর বেদনা পরিণত হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লবে, যার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৭৮৯ সালে। ১৪ জুলাই পতন হল ফরাসি সরকারের অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গের। বিপ্লবের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ফরাসি দেশ। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠল—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। ফ্রান্সের এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে ফরাসি রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে নেপোলিয়নের।

এরপর টানা সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে অনেক ওপরে উঠেছিল নেপোলিয়ন। গোটা ইউরোপকে কাঁপিয়েছিল। রাজার ঘরে জন্মে নি সে, কোনোদিন রাজপুত্রও ছিল না—অথচ তার প্রতিভা, কৌশলগত পরিকল্পনা আর রণনৈতিক গুণাবলির জন্যই ফরাসির সম্রাট হতে পেরেছিল সে। তবে সে যে রাজ্যলোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না, সেটা বারবার বোঝাতে চেয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে। রাজ-সিংহাসন সম্পর্কে একবার এক নিরাসক্ত বক্তব্যে সেটার যথার্থ প্রমাণ মেলে 'ভেলভেটে মোড়া এক টুকরো কাঠ, এই তো সিংহাসন ...।' অথবা, স্ত্রী জোসেফাইনকে একবার বলেছিল, 'আমাকে সম্রাট বলে সম্ভাষণ করবার দরকার নেই। আমি যা ছিলাম তাই আছি। কিছুই বদলায় নি।' কিন্তু প্রশ্ন জাগে, তার এই নীতিকথায় কি অন্তরের সায় ছিল? যদি তাই হয়, তাহলে ফরাসিদের কল্যাণ কামনায় একদিন যে শাসনদণ্ড হাতে তুলে নিয়েছিল, দুর্দশাগ্রস্ত ফরাসিদের শাসনক্ষেত্রে সংস্কার চেয়েছিল, সে-ই কিনা আবার ইউরোপের মানচিত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে, সুবিশাল ফরাসি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দেখে আত্মতৃপ্তিতে পুলকিত হত। এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পূর্ব-পশ্চিমে দু হাজার মাইল, আর উত্তর-দক্ষিণে এগার শ পঞ্চাশ মাইল। এটা কি তার রাজ্যলোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনের পরিচয় নয়? অনেকের কাছেই এটা একটা বিতর্কিত প্রশ্ন। তবে নেপোলিয়ন নিজেই সে-প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছে। একটা কথা সে

আক্ষেপ করে বারবার বলেছে, 'আমি আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারি নি। আমাকে জীবনভর পরিস্থিতির নির্দেশে চলতে হয়েছে ...।' সত্যিই তাই—নেপোলিয়ন শান্তি চেয়ে, মৈত্রী চেয়ে শুধু যুদ্ধই পেয়েছে। অতএব ইংরেজরা যদি তাকে যুদ্ধবাজ, রাজ্যলোভী, উচ্চাভিলাষী বলে দোষারোপ করে থাকে, সেটা নিছকই তাদের কূটনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের দিকে খুব কমই মনোযোগ দিয়েছে নেপোলিয়ন। উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছে এক রণাঙ্গন থেকে অন্য রণাঙ্গন। একনাগাড়ে আঠার ঘণ্টা কাজ করেও ক্লান্ত হয় নি। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। কর্তব্য ছিল তার কাছে সবকিছুর উর্ধ্বে, তাই তো বিয়ের মাত্র দু দিন পর মধুচন্দ্রিমা না করেই ইতালি অভিযানে চলে গিয়েছিল সে।

নেপোলিয়নের রাজনৈতিক নীতিমালার আরো একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তখন, সেটা হল সমগ্র ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দেয়া। কিন্তু পাশাপাশি এ-কথাও তার অজানা ছিল না যে, বিপ্লবী ফ্রান্স ছিল তৎকালীন ইউরোপের সনাতনী ব্যবস্থার হুমকিস্বরূপ। এ জন্যই বিপ্লবী ফ্রান্সের সাথে সমগ্র ইউরোপের দ্বন্দ্ব ছিল অবশ্যম্ভাবী। এবং হয়েছিলও তাই। এ জন্য অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সমরনীতিতে সে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও রাজনৈতিক কূটচাল ও পররাষ্ট্রনীতিতে সে পরিচালিত হয়েছে ভাবাবেগে। নেপোলিয়ন 'বিপ্লবের সন্তান' বলে নিজেকে দাবি করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার বৈপ্লবিক আদর্শ কালের স্রোতধারার অনুকূলে ছিল না, তাই ইউরোপের জোটভুক্ত রাষ্ট্রপ্রধানরা তাকে বিশ্বশান্তির অন্তরায় বলে ঘোষণা করে। এবং পরবর্তীতে এটাই তার চূড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে আনে।

তাই মাঝেমধ্যে মনে হয়, নেপোলিয়ন যোদ্ধা না হয়ে যদি শুধু শাসক হয়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমারেখা টেনে রাখত, তাহলে বলা যায় না তার ইতিহাস কোন গৌরবের কাহিনী হয়ে লেখা থাকত। কী হত কে জানে, তবে এ-কথা ঠিক যে, ইতিহাস তার জীবনীকে কেবল বারুদের গন্ধ দিয়ে বিষাক্ত করতে পারত না। সে নিজেও সেটা একদিন বুঝতে পেরেছিল, তবে অনেক দেরিতে—জীবনের শেষ অঙ্কে, সবকিছু হারিয়ে, সেন্ট হেলেনার সেই নির্বাসিত জীবনে।

দু-চার কথায় এ মহা সমরনায়কের ব্যর্থতা ও সাফল্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সে ছিল ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তিত্ব। কেউ কেউ তাকে তুলনা করেছে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার, সিজার ও শার্লেমেন-এর মতো শ্রেষ্ঠ বীরদের সাথে। আবার কেউ কেউ তাকে তুলনা করেছে বাতিকগ্রস্ত হিটলারের সাথে। তবে যে যা-ই বলুক, আর ইতিহাস তার জীবনীকে যতই বারুদের গন্ধে বিষাক্ত করে রাখুক, ব্যক্তিমানুষ নেপোলিয়নের ভেতর যে প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধের আবেগ, মহত্ত্ব, ভালবাসা আর আহত-অসহায়দের প্রতি তার যে মানবতাবোধ, তা কি অস্বীকার করা যায়? না, যায় না। তার গোটা জীবনটাকে ব্যাখ্যা করে, বিশ্লেষণ করে এই বিশ্বাসই হয় যে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে যে-সব ব্যক্তিত্ব অমরত্ব লাভ করেছে, নেপোলিয়ন তাদের মধ্যে প্রথম সারির একজন।

তাই ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে, বিভিন্ন তথ্যমূলক গ্রন্থের সাহায্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কর্মবহুল, বহুযুদ্ধখ্যাত জীবনের যে-ব্যর্থতা আর সফলতার চিত্র এই বইতে তুলে ধরা হল, তার যথার্থ মূল্যায়ন হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে আমার বিনীত আরজ, এই বইতে তথ্যগত কোনো ভুলভ্রান্তি কারো দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহ করে তাঁদের মতামত আমাকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে সেগুলো গ্রহণ করব।

২৮ জুন, ১৯৯০ **সৈয়দ আতিকুর রহমান**

কর্সিকা।

ফ্রান্স থেকে প্রায় এক শ মাইল দূরে, ইতালির পশ্চিমে আর সার্ডিনিয়ার উত্তরে। চারদিকে ভূমধ্যসাগর। দ্বীপ জুড়ে পাহাড়-পর্বত আর পাইন, বাদাম, জলপাইয়ের অরণ্যানী। সব মিলিয়ে ছায়া সুনিবিড়, চিরহরিৎ দ্বীপ কর্সিকা।

কিন্তু শান্তি নেই কর্সিকার জীবনে। জেনোয়ার অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে কর্সিকাকে মুক্ত করবার জন্য কত-না লড়াই করতে হয়েছে স্বদেশভক্ত নেতা পায়োলীকে। এখন শোনা যাচ্ছে জেনোয়া সরকার নাকি দ্বীপটাকে ফ্রান্সের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ব্যাপারে নাকি একটা চুক্তিও হয়ে গেছে।

যেমন চুক্তি তেমন কাজ। ১৭৬৮ সালের আগস্ট মাস। কয়েকটা ফরাসি যুদ্ধজাহাজ এগিয়ে এল কর্সিকার ব্যাস্টিয়াতে। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল পায়োলী বিদেশী শক্তির কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াবে না তারা। হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু

পায়োলীর সুদক্ষ নেতৃত্বে হঠে যেতে বাধ্য হল ফরাসি সেনাবাহিনী। প্রায় পাঁচ শর মতো বন্দি হল কর্সিকা যোদ্ধাদের হাতে।

পরের বছর আরো বেশি সংখ্যায় সেনাবাহিনী নামল কর্সিকার উপকূলে। এবারো মরণপণ যুদ্ধ করল দুর্ধর্ষ কর্সিকাবাসী। তবে এবার আর ওদের আটকানো গেল না। কর্সিকান যোদ্ধাদের তুলনায় ফরাসি সৈন্যের সংখ্যা অনেক অনেক গুণ বেশি। বীরত্ব দেখাবার, প্রাণ বিসর্জন দেবারও তো একটা সীমা আছে। শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করল পায়োলী। শান্তি স্থাপন করতে রাজি হল ফরাসি কর্তৃপক্ষ। তবে পায়োলীকে যেতে হবে ইংল্যান্ডে। নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হবে তাকে। চার্লস বোনাপার্ট আর তার স্ত্রী ল্যাটিজিয়া ভারাক্রান্ত মনে বিদায় জানাল তাদের প্রিয় নেতা ও বন্ধুকে। কর্সিকার মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হল কর্সিকার জাতীয় পতাকা। তার বদলে সেখানে উড়তে লাগল সাদা লিলিফুল আঁকা নীল রঙের পতাকা। ফরাসি পতাকা।

পায়োলীকে ইংল্যান্ডগামী জাহাজে তুলে দিয়ে ফিরে এল চার্লস আর ল্যাটিজিয়া। তার কিছুদিন পর, ১৭৬৯ সালের ১৫ আগস্ট ভূমিষ্ঠ হল তাদের দ্বিতীয় সন্তান। বাবা নাম রাখল নেপোলিয়ন। কর্সিকানরা উচ্চারণ করত নাবুলিয়ন। তাদের প্রথম সন্তানের নাম জোসেফ।

এর পর একে একে আরো কয়েকটা সন্তান এসেছে ল্যাটিজিয়ার কোলে। কর্সিকান মেয়েরা বহু সন্তানবতী হওয়া পরম গর্বের বিষয় বলে মনে করত।

পুরো কর্সিকান চরিত্র নিয়ে বড় হতে লাগল ছেলে দুটো। আত্মমর্যাদা ছিল কর্সিকানদের বড় সম্পদ। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে–কোনো অপমান, আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়া। এই প্রতিশোধের ব্যাপারটা মাঝে মাঝে বংশপরম্পরায় বংশধরদের মধ্যেও গড়িয়ে যেত। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে এই ধরনের কত গল্পগাথা শুনত নেপোলিয়ন। এর মধ্যে কত বীরত্ব, কত আস্ফালন!

ইতোমধ্যে আরো দুটো ছেলেমেয়ে এসেছে সংসারে। এবার বড় ছেলে দুটোর ভালো শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবতে বসল চার্লস বোনাপার্ট। নেপোলিয়নের বয়স তখন ছয় বছর। বড় ভাই জোসেফ তার চাইতে উনিশ মাসের বড়। নেপোলিয়নকে ধর্মীয় স্কুলে পড়াবে বলে ঠিক করল চার্লস। তারপর ষোল–সতের বছর বয়সে পিসায় গিয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হবে। আর যদি ভালোভাবে লেখাপড়া শিখতে চায় তাহলে যেতে হবে খোদ ফ্রান্সে। তবে খরচ। অত খরচ কী করে সামলাবে চার্লস!

এরপর শুরু হল নেপোলিয়নের ভাগ্যের ইতিহাস। কর্সিকার শাসনকর্তা হয়ে এল লুই চার্লস রেনে, কাউন্ট অব মার্বো। মার্বোর সাথে বোনাপার্ট পরিবারের বেশ একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠল। দুষ্ট লোকেরা বলে, ল্যাটিজিয়া সম্পর্কে মার্বোর প্রচ্ছন্ন অনুরাগই নাকি এই হৃদ্যতার মূল কারণ। সে যাই হোক, ল্যাটিজিয়ার মূল লক্ষ্য কিন্তু সন্তানদের মঙ্গল, তাদের উন্নতি। মার্বো খবর দিল যে, কোনো ফরাসি নাগরিক যদি টাকা–পয়সার অভাবে পড়ে তাহলে তার ছেলেমেয়েরা রাজবৃত্তির সাহায্যে লেখাপড়া করতে পারে। মার্বো সেই ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। ছেলেদের মধ্যে যদি কেউ সামরিক স্কুলে ঢুকতে চায়, ঢুকবে। কেউ যদি জীবনে যাজকবৃত্তি গ্রহণ করতে চায়, তারও শিক্ষায়তন আছে।

হাতে স্বর্গ পেল চার্লস আর ল্যাটিজিয়া। এখন ভাবনা হল ছেলে দুটোর মধ্যে কাকে কী পড়াবে। শেষে ঠিক হল, শান্ত নির্বিরোধ ছেলে জোসেফকে দেওয়া হবে যাজকবৃত্তি–শিক্ষণ–বিদ্যালয়ে আর দুর্দান্ত, বুদ্ধিমান ছেলে নেপোলিয়ন যাবে সামরিক স্কুলে। এই সিদ্ধান্তে শুধু ফরাসি ইতিহাসে নয়, গোটা ইউরোপের ইতিহাসে অলক্ষে একটা নামের স্বাক্ষর পড়ল

যাবার দিন ঘনিয়ে এল জোসেফ আর নেপোলিয়নের। ফ্রান্সের অ্যাই শহরে যাজক স্কুলে যাবে জোসেফ। আর নেপোলিয়ন যাবে ব্রিয়েনের সামরিক স্কুলে। যাত্রার দিন স্থির হল ১২ ডিসেম্বর, ১৭৭৮ সাল। আগের দিন সন্ধ্যায় দুই ছেলের সবকিছু গুছিয়ে দিল ল্যাটিজিয়া। তারপর গির্জায় নিয়ে গেল ফাদারের আশীর্বাদ চাইতে। মা–বাবার কোল ছেড়ে চলে যাচ্ছে দুটো ছেলে... ওদের জীবন যেন সফল হয়, সার্থক হয় ...।

তার পরদিন। ১২ ডিসেম্বর। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে উঠল জোসেফ আর নেপোলিয়ন।

ফ্রান্সে গিয়ে প্রথম চারটা মাস অটান কলেজে কাটাল নেপোলিয়ন। শুধু ফরাসি ভাষা শিখেছে। কিন্তু শিখলে কী হবে, এতকালের ইতালীয় ভাষায় অভ্যস্ত নেপোলিয়নের মুখে ফরাসি ভাষার উচ্চারণ দুরস্ত হল না। শিক্ষকেরা বিরক্ত হল। ক্লাসের সহপাঠীরা ঠাট্টা–

তামাশা করতে লাগল। নেপোলিয়ন যে খোদ ফরাসি দেশের লোক নয়, কর্সিকার লোক, একদিন যে-দেশ কিনা ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল—সেটা যেন ওখানকার ছাত্র-শিক্ষকেরা ভুলতে পারে নি। নেপোলিয়নকে বাঁকা চোখে দেখতে লাগল তারা।

একদিন এক শিক্ষক তো বলেই ফেলল, 'তোমরা, কর্সিকানরা, নিজেদের খুব সাহসী বলে জাহির কর। তবে আমাদের সৈনিকদের কাছে হার মেনেছিলে কেন...?'

নেপোলিয়ন জবাব দিয়েছিল, 'আমাদের একেক জনের বিরুদ্ধে আপনাদের ছিল দশ জন। কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি বড় হই। এর প্রতিদান কী করে দিতে হয় দেখাব।'

ব্যঙ্গ করেছিল শিক্ষক, 'তোমাদের সেনাপতি নাকি একজন মস্ত বড় লড়ুয়ে ছিলেন ... তবে ...।'

'তিনি ছিলেন না, স্যার, এখনো আছেন। আমিও একদিন তাঁর মতো হব।'

চার মাস পর। ১৭৭৯ সালের মে মাস। ব্রিয়েনের মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তি হল নেপোলিয়ন। ব্রিয়েন ছিল ফরাসিদের শ্যাম্পেন অঞ্চলের একটা অংশ। বনভূমি, পুকুর, বড় বড় বাগান আর কয়েকটা ডেয়ারি ফার্ম মিলে সুন্দর, সরলতায় ঢাকা এক শহর। একাডেমির প্রবেশপথের দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখ জুড়ানো লাইম গাছ।

এখানে শুরু হল নেপোলিয়নের নতুন জীবন। কঠিন নিয়ম আর শৃঙ্খলে বাঁধা জীবন। সেই ভোর ছটায় উঠে, নীল ইউনিফর্ম পরে শুরু হত দৈনন্দিন রুটিন। কিছু সময় ফরাসি আইনের ক্লাস। তারপর একটু প্রার্থনা। প্রার্থনার পর সাদা রুটি আর ফল দিয়ে ব্রেকফাস্ট। তার পর আবার ক্লাস। ইতিহাস, ভূগোল আর অঙ্কের পাশাপাশি শেখানো হত কেমন করে দুর্গ তৈরি করতে হয়, ম্যাপ চিনতে হয়, ইত্যাদি।

দুপুরে স্যুপ, সেদ্ধ মাংস, আর অনেকটা পানি-মেশানো দেশী মদ দিয়ে পেট-ভরা লাঞ্চ। এরপর আবার শুরু হত ক্লাস। যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানান টুকিটাকি শিক্ষা, অবশেষে রাতে সাপার সেরে, প্রার্থনা করে ঘুমোতে যাবার ঘণ্টা। এই ছিল ব্রিয়েন মিলিটারি একাডেমিতে নেপোলিয়নের রোজকার রুটিন।

সেই দিনগুলোতে নেপোলিয়ন ছিল নিঃসঙ্গ, স্বল্পভাষী আর বিমর্ষ। এর কারণ ছিল। ব্রিয়েনের ছাত্র-সঙ্গীরাও ঠিক অটানের মতো ব্যবহার করত তার সাথে। বরং তাদের ব্যবহারে একটু বাড়াবাড়িই ছিল। নেপোলিয়নের লম্বা কোট দেখে, তার ভুল ফরাসি শুনে, তাকে কর্সিকান ছেলে জেনে ঠাট্টা-তামাশায় পাগল করে তুলত। তাছাড়া ছাত্রদের বেশিরভাগই ছিল ফ্রান্সের খানদানী পরিবারের ছেলে। টাকার অহংকারে সবকিছুকে তুচ্ছ মনে করত তারা। রাজবৃত্তির অনুগ্রহে নেপোলিয়ন পড়ছে জানতে পেরে ওইসব ছেলেরা তাকে প্রতিটা কথায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইত।

বাবাকে চিঠি লিখল নেপোলিয়ন, 'এখানকার ছেলেরা সবকিছুকে কেবল টাকা দিয়ে বিচার করে। আমি কি পয়সার দম্ভে দাম্ভিক ছেলেগুলোর কাছে মাথা নিচু করে থাকব? আমি কি এই জঘন্য জায়গা ছেড়ে যেতে পারব না?' বাবা জবাব দিল, 'আমাদের যথেষ্ট টাকা নেই। তাই যেখানে আছ, সেখানেই থাকবে...।'

ব্রিয়েনের মিলিটারি একাডেমিতে ওই অবস্থাতেই পাঁচটা বছর কাটিয়ে দিল নেপোলিয়ন।

ততদিনে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে ফ্রান্সের আকাশে। জনজীবনে গুমরে উঠছে

জমাটবদ্ধ অসন্তোষ। একদিকে রাজা-রানী, অভিজাত শ্রেণী, ঐশ্বরিক মহিমায় দর্পিত যাজক সম্প্রদায়, সম্পদ-ফেনিল উচ্ছ্বসিত জীবন—কেবল খাওদাও ফুর্তি কর। অন্যদিকে লাঞ্ছিত, নিদারুণ অভাবে মুমূর্ষু, বঞ্চিত ফরাসি জনতা—তাদের মধ্যে আছেন বুদ্ধিজীবী রুশো, ভলতেয়ার, মঁতাস্কু, দিদেরো এবং আরো অনেকে; যাঁরা কলমের ডগায় দাবির হুঙ্কার ছাড়ছেন, মনুষ্যত্বের নতুন ব্যাখ্যা করছেন, ধারালো যুক্তির ছেনি দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হানছেন চার্চের কঠিন দেয়ালে, রাজপ্রাসাদে, ঐশ্বর্যমণ্ডিত জীবনে। সারা ফ্রান্সের ধুঁকে থাকা লোকগুলো এতদিনে চোখ মেলে তাকিয়ে একটু একটু করে যেন বুঝতে পারছে, কত দিন ধরে বংশপরম্পরায় তারা নিজেদের নিদারুণ অনটন দিয়ে, মনুষ্যত্বের অপমান করে কেমন খাদ্যরস যুগিয়েছে ধনীর দুলালদের। তাদের গায়ে পরিয়েছে ঝকমকে পোশাক, তাদের গাড়ি চলেছে টগবগিয়ে, রাস্তার লোকদের ভীতচকিত করে...। কিন্তু এবার ...? এবার নাকি ওই ধনী লোকগুলোর যথেচ্ছ চলার পথে বাধা দেবার সময় এসেছে। আর ভক্তি নয়, এবার যুক্তি। যুক্তির সাথে হাত মেলাবে শক্তি।

১৭৮৪ সাল। পনেরতে পা দিল নেপোলিয়ন। এমন সময় বাড়ি থেকে নির্দেশ এল, এবার তাকে ব্রিয়েন ছাড়তে হবে। কারণ তার জায়গায় এবার আসবে ছোট ভাই লুসিয়েন। অতগুলো ভাইবোন যখন, পালা করে না পড়লে কি চলে...? ওদিকে বাবা চার্লসের স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছে। রোগা হয়ে গেছে, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। মা ল্যাটিজিয়ার শরীরও ভালো নেই। শেষ সন্তানটা প্রসবের পর শয্যাশায়ী।

নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হয়ে উঠল নেপোলিয়ন। তার জায়গায় লুসিয়েনকে বসিয়ে সে যাবে কোথায় ...? ভাগ্য সহায়, শেষ পর্যন্ত যোগাড়যন্ত্র করে স্থির হল—প্যারিস। ১৭ অক্টোবর ব্রিয়েন ছাড়ল নেপোলিয়ন। লম্বা চুল, পেছনে রিবন দিয়ে বাঁধা। পথে কয়েকবার গাড়িঘোড়া পাল্টে ২১ অক্টোবর পৌঁছল প্যারিসে।

প্যারিসে পা দিয়ে সত্যি কথা বলতে কি, বেশ কিছুটা হকচকিয়ে গেল নেপোলিয়ন। একসাথে এত ঐশ্বর্য, আবার তারই তলায় এত দারিদ্র্য কখনো চোখে পড়ে নি তার। অবাক হয়ে দেখত, কেমন করে ঐশ্বর্যশালী ভাগ্যবানরা রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে যায়, গাড়ির আগে আগে পাইলট কারের মতো ছুটে চলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর—রাস্তার মাঝখানে যেন কোনো ইতর হতভাগা এসে না পড়ে, চলার ছন্দ যেন বেসুরো হয়ে না বাজে। গাড়ির চাকার দুপাশে ছিটকে যেত কাদা, ধুলোবালি। লাগলই-বা রাস্তার ধারে বসে থাকা অভিশপ্ত, নিরন্ন লোকগুলোর গায়ে। তারাই তো আবার উল্লাসে চিৎকার করে উঠবে যখন গাড়ির সদাশয় ধনীলোকটা দু-চারটে পয়সা ছুড়ে মারবে তাদের দিকে। মজা পাবে, মানুষ নামে ওই প্রাণীগুলো সামান্য দু-চারটে পয়সার জন্য কেমন লুটোপুটি খায় দেখে। প্যারিসের রাস্তায় তখন আলো। স্ট্রিট ল্যাম্প। তার আশপাশে বুভুক্ষু মানুষের চলমান জীবন

প্যারিসের যে মিলিটারি স্কুলে নেপোলিয়ন ক্যাডেট হয়ে এল, তার জাঁকও বড় কম ছিল না। যেমন বাড়ি, তেমনি চমৎকার পরদা-ঝোলানো সব দরজা-জানালা, খাবার ব্যবস্থা। একেবারে রাজকীয়। যাঁরা পড়াতেন, শিক্ষা দিতেন, তাঁরাও প্রত্যেকে ছিলেন সব জাঁদরেল সামরিক অফিসার। পুরোপুরি সামরিক আবহাওয়া। নেপোলিয়নের বড় পছন্দ। তবে এখানেও যে দু-একটা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটেছে তা নয়। কয়েকবারই হাসি-ঠাট্টার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে।

ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়ল চার্লস বোনাপার্ট। গির্জায় গিয়ে ফাদারের আশীর্বাদ চাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ১৭৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারা গেল সে। পাকস্থলীতে ক্যান্সার হয়েছিল তার।

খবর পেয়ে দু চোখ ভিজে গেল নেপোলিয়নের। বাবাকে ভালবাসত সে, শ্রদ্ধা করত।

সামরিক জীবনে শেষ পর্যন্ত গোলন্দাজের জীবন বেছে নিল নেপোলিয়ন। আর্টিলারি বিভাগে ভালো ফল করল, ভালো শিখল। অবশেষে সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের পদ পেল। নেপোলিয়নের বয়স তখন ষোল বছর পেরিয়ে পনের দিন। যারা এই কমিশন পেল, প্রথামতো তাদের প্যারেড হল। প্যারেডের পর পদমর্যাদাজ্ঞাপক ব্যাজ দেওয়া হল সবাইকে। চামড়ার বেল্ট, কারুকাজ-করা রুপোর খাপ আর একখানা তরবারি।

'তরবারিটা ফ্রান্সের, ধারটা আমার, একেবারেই আমার...' তরবারির ওপর হাত বুলিয়ে মন্তব্য করেছিল নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়নের নতুন জীবনের কর্মস্থল হল ফ্রান্সের ভালেন্স শহরে। রেজিমেন্টের নাম লা ফেয়ার। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম নটা সপ্তাহ সৈনিকের যাবতীয় করণীয় কাজকর্ম শিখতে হয়েছে তাকে। অবসর সময়ে পড়াশোনা করত প্রচুর। এই পড়ার মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল না। উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনী—যা সামনে পেত পড়ে ফেলত।

এমনি করেই গেল কিছুদিন। নেপোলিয়ন দেখল ও বুঝল, দেশে দেশে শাসনের নামে কত অন্যায়, কত অত্যাচার—বিচারের নামে কী অবিচার, রাজার দণ্ড কী নিপীড়ন বয়ে আনে অজ্ঞ, মূর্খ ও সাধারণ প্রজাদের ওপর। ইংরেজ লেখক জন ব্যারোর একটা বই পড়ে সে বুঝতে পেরেছিল, মানুষের মনে জাতীয়তাবোধ বড় শক্তিশালী আবেগ। একটু সুযোগ পেলে এই আবেগ আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে।

এইসব বই পড়ত আর ভাবত, কেমন করে উপযুক্ত শাসননীতি দিয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষকে অবিচার-অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

দুর্দশাগ্রস্ত, ক্লিষ্ট, শীর্ণ ফরাসিদের শাসনক্ষেত্রে সংস্কার চাইল নেপোলিয়ন।

খবর এল, বোনাপার্ট পরিবারের বন্ধু, ফরাসি গভর্ণর মার্বো মারা গেছে। অতএব এতদিন ধরে বিধবা ল্যাটিজিয়া যা-কিছু সরকারি বৃত্তি পেয়ে আসছিল সব বন্ধ হয়ে গেছে। মহা চিন্তায় পড়ল নেপোলিয়ন। ফ্রান্সের কয়েকজন হোমরাচোমরার দুয়ারে ধরনা দিল, যাতে মা আবার আগের মতোই কিছু বৃত্তি পেতে পারে। জবাব মিলল—না, কিছু হবে না। মানুষের এই হৃদয়হীনতা অসহ্য মনে হল নেপোলিয়নের কাছে। আরো যেন বেশি করে বুঝতে পারল, কর্সিকার ওপর ফ্রান্সের কী নিদারুণ ঔদাসীন্য! কী ভয়ঙ্কর উপেক্ষা!

মনের জ্বালা মেটাতে ঠিক করল নেপোলিয়ন; একটা বই লিখবে। লিখবে কর্সিকার ইতিহাস, জেনোয়ার বিরুদ্ধে কর্সিকার সেই বীরত্বব্যঞ্জক বিদ্রোহের ইতিহাস, স্বদেশভক্ত বীরদের সেই অসম সাহসিক কাহিনী। পায়োলীর কাছে কিছু তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠাল নেপোলিয়ন। পায়োলী জবাব দিল, ইতিহাস লেখা কোনো ছেলে-ছোকরার কাজ নয়। নেপোলিয়নের বড় ইচ্ছায় ঠাণ্ডা পানি ঢালল পায়োলী। কেন কী জানি, নেপোলিয়নের সেই অসম্পূর্ণ ইতিহাসের এক জায়গায় লেখা ছিল, কর্সিকার উপযুক্ত নৌশক্তি থাকলে সে কখনোই স্বাধীনতা হারাত না।

এল ১৭৮৯। শীতটা বড় জোর পড়ল সেবার। বরফে ঢাকা পড়ল নদীনালা। ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হল আকাশছোঁয়া। এক মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার পড়ে গেল চারদিকে। নৌকোভর্তি গম লুট হয়ে গেল স্যারে নামে এক শহরের নদীর বুকে। কিছু সৈনিকসহ নেপোলিয়নকে পাঠানো হল সেখানে। বুঝতে পারল নেপোলিয়ন—ঝড় এসে গেছে। অনেক দিনের জমে থাকা মেঘ এবার আর বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে না। চিৎকার করে উঠল ফ্রান্সের জনতা। জ্বলে উঠল ফরাসি বিপ্লবের আগুন। বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন সুপণ্ডিত মিরাবোঁ। রুখে দাঁড়ালেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। নিজে সর্বহারা না হয়েও লাঞ্ছিত ফরাসি জনগণের পক্ষ নিলেন তিনি।

১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই । ফরাসি সরকারের অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপ্লবীরা। ওই বাস্তিলের রুদ্ধ কক্ষগুলোতে কত-না বছর ধরে গুমরে কেঁদেছে বন্দি মানুষের নিরুদ্ধ বেদনা। দেয়ালে মাথা কুটেছে। হাতে-পায়ে শেকলের অবিরত ঘর্ষণে আর্তনাদ করেছে। এর কোনো বিচার ছিল না, প্রতিকার ছিল না। রাজার প্রাসাদে, ধনীর বিলাসে সেদিন শুধু দম্ভের উল্লাস। পতন হল বাস্তিল দুর্গের। আকাশে-বাতাসে ধ্বনি উঠল—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ রক্ষার্থেই সমাজে যা-কিছু তারতম্য, নইলে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই। বিপ্লবের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা ফরাসি দেশ। দ্রুত এগিয়ে চলল ইতিহাস।

সংবিধান-সভা আহ্বান করল বিপ্লবীরা। সাধারণের রক্ত নিংড়ে এতদিন যারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে আসছিল, নতুন সংবিধানে তার অনেক কিছু ছেঁটে দেওয়া হল। গঠিত হল জাতীয় বাহিনী বা ন্যাশনাল গার্ড। সব-পাওয়ার-দল এতদিনকার সুবিধায় এমন বাদ সাধতে দেখে প্রতিবাদ জানাল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল নেপোলিয়নের চেনাজানা, সঙ্গীসাথী অফিসারের দল।

নেপোলিয়ন তার সর্বসত্তা দিয়ে ইতিহাসের এই মহান পরিবর্তনকে স্বাগত জানাল। পূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করল। নতুন সংবিধান অনুযায়ী যে 'সোসাইটি অব ফ্রেন্ডস অব দ্য কনস্টিটিউশন' গড়ে উঠল, নেপোলিয়ন হল তার অন্যতম সদস্য ও সম্পাদক। কোনো বিদেশী শক্তির প্রভাবে বিপ্লব যেন মিথ্যে না হয়ে যায়। নতুনের জয় হোক...।

এসব কিছু ঘটতে সময় গড়িয়ে এল ১৭৯১-তে। নেপোলিয়নের বয়স তখন একুশ পেরিয়ে বাইশে যাচ্ছে।

ততদিনে গোটা ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফরাসি বিপ্লব। বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান উগ্রতা দেখে মাথায় হাত দিল ইউরোপের অন্যান্য রাজা মহারাজারা। কারণ ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ যে শুধু ফরাসি রাজ্যের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে থাকবে, এমন তো কোনো কথা নেই। অন্য রাজ্যে তার ছোঁয়া লাগতে কতক্ষণ। রীতিমতো ভাবনায় পড়ল ইউরোপের কর্ণধাররা। নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করতে লাগল। অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। ফ্রান্স আক্রমণ করল। উদ্দেশ্য, ফ্রান্সে আবার আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা। অস্ট্রিয়ার মাথাব্যথার কারণ ছিল। কারণ অস্ট্রিয়ারই মেয়ে মারিয়া আঁতায়োনেত তখন ফ্রান্সের রানী।

ইতোমধ্যে বিপ্লবীরা একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এর ওপর ঠিক এই সময় তাদের নেতা মিরাবোঁ মারা যাওয়াতে গোটা ব্যাপারটা যেন আরো গোলমেলে হয়ে গেল। একদিকে নতুন

সংবিধান-সভার অধিবেশন চলতে লাগল, অন্যদিকে বিপ্লবীরা উগ্র থেকে উগ্রতর হতে থাকল।

এমনি এক দিনে নেপোলিয়ন বিস্ময়ভরা চোখ মেলে দেখল, প্রায় পাঁচ-ছ হাজার মানুষ এগিয়ে আসছে সংবিধান অফিসের দিকে। রক্তচক্ষু, শীর্ণদেহ এই বুভুক্ষু জনতার কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে বন্দুক, লাঠি ইত্যাদি। তাদের অনেকের মাথায় জড়ানো টকটকে লাল কাপড়ের টুকরো। বুঝতে পারল নেপোলিয়ন—ওরা জেকোবিন দলের সদস্য, উগ্র বামপন্থী। বিপ্লবকে কেন্দ্র করে তখন বিপ্লবীদের মধ্যে অনেক দলই গড়ে উঠেছে। গিরোনডিস্ট দলেরও কম প্রতিপত্তি ছিল না। আর দলাদলির ফাঁকেই বিপ্লবের আদর্শ হয়েছিল বিকৃত, বিপর্যস্ত।

সংবিধান-সভাগৃহে ঢুকে পড়ল ওই খ্যাপা জনতা। মুখে তাদের বিপ্লবের জয়গান। সামনে এক টুকরো তক্তা। তার ওপর পেরেক দিয়ে আটকানো একটা ষাঁড়ের হৃৎপিণ্ড। তক্তার গায়ে লেখা 'রাজা ষোড়শ লুইয়ের কলিজা'।

এরপর ট্যুইল্যারি প্রাসাদে গেল তারা। প্রাসাদের সুপ্রশস্ত, মসৃণ সোপান বেয়ে উপরে উঠে গেল। উত্তেজনায় উন্মাদ।

আশ্চর্য, মারমুখী জনতার যাবতীয় রোষের লক্ষ্য যে ষোড়শ লুই, তিনি কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। শান্তভাবে তাদের উপস্থিতি মেনে নিলেন। একসাথে বসে মদ খেলেন। ঘণ্টা দুয়েক এভাবে চলার পর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করল জনতা।

নেপোলিয়ন তার বড় ভাইকে চিঠি লিখল, 'এইসব ঘটনা বেআইনি, অবৈধ... এর ফল বড় সাংঘাতিক।'

অচিরেই ফলে গেল নেপোলিয়নের সাবধান-বাণী। বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে যা খুশি তা-ই করতে লাগল জেকোবিন দলের বিপ্লবীরা। সংবিধান-সভার কোনো কাজ চালাতে দিল না, কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে চাইল না। বিষণ্ন মনে ভাবতে লাগল নেপোলিয়ন, সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার বাণী দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু, তার এ কী উচ্ছৃঙ্খল চেহারা...!

১৭৯২ সালের আগস্ট মাসে ক্যাপ্টেনের পদে পদোন্নতি পেল নেপোলিয়ন। এদিকে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল ফ্রান্সের ইতিহাস। জেকোবিনরা তখন দুর্বার, দুর্দম। তারা আরো ঝলসে উঠল যখন তারা ভাল্‌মীর যুদ্ধে অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে হারিয়ে দিল। বাইরের শত্রু, ভেতরের শত্রু সব নিপাত যাক—এই ছিল তখন বিপ্লবীদের মুখের বুলি। বাইরের শত্রু অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়া, কিন্তু ভেতরের শত্রু? ভেতরের শত্রু রাজা, রানী, রাজপরিবারের লোক, রাজ্যর যত অভিজাতের দল। যেখানে যাকে পাবে, শুধু ধর আর মার।

ভাল্‌মীর যুদ্ধে জয়ী বিপ্লবীরা উৎসাহের চোটে অস্ট্রিয়ার অধীন বেলজিয়াম আক্রমণ করে বসল। হল্যান্ড আক্রমণের তোড়জোড় করল। পীড্‌মন্টের রাজার কাছ থেকে স্যাভয় আর নিস্ কেড়ে নিল। ইংল্যান্ড সতর্ক হল।

ইতোমধ্যে আরো কিছু পরিবর্তন হয়েছিল ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসে। সংবিধান-সভা নামান্তরিত হয়েছিল ন্যাশনাল কনভেনশন বা জাতীয় সভায়। কনভেনশনের নির্দেশে বিপ্লব যখন এক নতুন চেহারায় রূপ নিচ্ছে, ঠিক সেই সময় খবর পাওয়া গেল, ইংল্যান্ডে কয়েক বছর নির্বাসনজীবন কাটিয়ে আবার কর্সিকায় ফিরে এসেছে জেনারেল পায়োলী। নিজেকে কর্সিকার সর্বময় শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করেছে। দুষ্ট লোকে বলে, পায়োলী নাকি সেই আগের চেহারায় ছিল না। সে নাকি তখন রীতিমতো ইংরেজভক্ত হয়ে নিজের

দেশ কর্সিকাকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেবার পাঁয়তারা কষছে। বোনাপার্ট পরিবারের ওপর রেগে কাঁই হয়ে রয়েছে। বোনাপার্ট পরিবারের এক সময়ের অন্তরঙ্গ পায়োলীর এই আচরণের পেছনে অবশ্য একটা কারণও ছিল। লুসিয়েন বোনাপার্ট এক মিটিঙে বলেছিল, পায়োলী নাকি ইংরেজদের চর। তার বর্তমান কাজকর্ম সবই নাকি ইংল্যান্ডের সমর্থনে। সে এখন মনেপ্রাণে ইংরেজ অনুগত। লুসিয়েনের এই খবর কনভেনশনের অধিবেশনেও ঝড় তুলল। পায়োলীকে গ্রেফতার করার আদেশ জারি হল। নেপোলিয়নকে পাঠানো হল কর্সিকায়।

কিন্ত পায়োলী তখন কর্সিকার শাসক। সেই জোরে সেও এক আদেশ জারি করল, জীবন্ত হোক আর মৃত হোক—নেপোলিয়নকে বন্দি করা চাই ...।

পায়োলীর প্যাঁচের সাথে পেরে উঠল না নেপোলিয়ন। শেষ পর্যন্ত মা, ভাই, বোনদের নিয়ে, নিজেদের বাড়ি–ঘর–দোর ছেড়ে শুধু পরনের কাপড়টুকু নিয়ে গোপনে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল। দুর্ভাগ্যের আঘাতে আঘাতে বড় হতে লাগল নেপোলিয়ন।

কর্সিকা থেকে পালিয়ে তুলোঁ বন্দরে উঠল সে। সময়টা ছিল ১৭৯৩ সালের জুন। ইতোমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায়। রাজা ষোড়শ লুই গিলোটিনে প্রাণ দিলেন। ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা চলে গেছে একটা নতুন শাসন সমিতির হাতে। নাম তার 'কমিটি অব পাবলিক সেফটি' বা জননিরাপত্তা সমিতি। বার জন সদস্য নিয়ে এই সমিতি। তাদের নেতা রোবস্‌পীয়ের। তার নীতি ছিল যা–কিছু উত্তম, তা–ই হল সাধারণতন্ত্রের আদর্শ। অতএব, যা অবৈধ, অন্যায়, খারাপ; তাকে দূর কর, ধ্বংস কর।

গলদ দেখা দিল এখানেই। কথাটা হল কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ সেটা কারা বিচার করবে? সেই বিচারক কি শুধু বার জন লোক? সংস্কার করা ভালো। কিন্তু তাই বলে সংস্কারের নামে উচ্ছেদ! একবার ওই পথে গেলে তার কি কোনো সীমা থাকে? আদর্শের মধ্যে আর কি ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়? বিশেষ করে রোবস্‌পীয়ের যেখানে মুহুর্মুহু হুঙ্কার ছাড়ছে, দয়া... মায়া—এসব বর্বরতা!

জেকোবিনদের বিরোধী দল গিরোনডিস্টরা ছিল একটু নরমপন্থী। জেকোবিনদের অত উগ্রনীতি, চড়া চড়া কথা তারা পছন্দ করত না। সুতরাং জেকোবিন নেতা রোবস্‌পীয়েরের ওই মতবাদ তারা অনেকেই মানতে চাইল না। শাসনের নামে এই দুঃশাসন অশুভ মনে হল। রোবস্‌পীয়ের বিপ্লবীদের একটা অংশের এই প্রতিকূলতা গ্রাহ্য তো করলই না, উল্টো আরো উগ্র, একগুঁয়ে হয়ে উঠল সে। এরপর শুরু হল সন্ত্রাসের রাজত্ব। রোবস্‌পীয়েরের দল যাকেই তাদের মতের বিরোধী বলে মনে করল তাকেই সন্দেহের আইনে ধরতে লাগল। ঠেলে পাঠাতে লাগল রেভ্যুলিউশ্যনারি ট্রাইবুনাল নামে নামকাওয়াস্তে এক বিচারালয়ে। একই দলের লোক সেখানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করত। বলা বাহুল্য, তাদের বিচারে সব অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হতে লাগল গিলোটিনের তলায়। রক্তাক্ত পথ ধরে গড়িয়ে চলল ফ্রান্সের ইতিহাস...

কিছুদিন তুলোঁতে থেকে সবাইকে নিয়ে ইতোমধ্যে মার্শেল শহরে চলে এসেছিল নেপোলিয়ন। তার কর্মস্থল নির্দিষ্ট হল এভিগ্‌ননের কাছে।

বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল সে, কীভাবে নষ্ট হতে বসেছে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ। দেশ জুড়ে কী সাংঘাতিক গৃহবিবাদের সূচনা দেখা যাচ্ছে। জননিরাপত্তা সমিতির

জেকোবিনরা ধর্ম, ন্যায়, নীতি কিচ্ছু মানছে না। ওদিকে সারা দেশে বিষফোঁড়ার মতো দল পাকাচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা। একজনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আরেকজন। ন্যাশনাল গার্ডের সৈনিকরাও বেসামরিক নগরবাসীদের মারতে কসুর করছে না। এই ডামাডোলের বাজারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রয়্যালিস্ট বা রাজতন্ত্রী দল। সাথে সাথে ফ্রান্সের ইতিহাসের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিপতিরা। বিকৃত বিপ্লবের নিষ্পেষণে মনের দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেল নেপোলিয়ন। অসুস্থ হয়ে পড়ল সে। সামরিক বিভাগে আবেদন জানাল, তাকে যেন রাইন অঞ্চলের সেনাবিভাগে বদলি করা হয়। সেখানে তবু ফ্রান্সের শত্রুর সাথে মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু গৃহযুদ্ধের মধ্যে থেকে ফরাসিদের মেরে চলবে, এটা সহ্য করা যায় না।

ঠিক সেই মুহূর্তে তুলোঁ বন্দরকে নিয়ে বিরাট এক সমস্যা দেখা দিল। প্রথমত, তুলোঁ ছিল বর্তমান ফরাসি শাসনতন্ত্রের একেবারে বিরোধী, সরকারবিরোধী। দ্বিতীয়ত, তুলোঁর অধিবাসীদের মনে এক বদ্ধমূল ধারণা হল যে, ফ্রান্সে শাসনের নামে যে অরাজকতা শুরু হয়েছে তার অবসান ঘটাতে হলে ফরাসি সিংহাসনে আবার বুরবোঁ রাজবংশকে ফিরিয়ে আনতে হবে। একজন বুরবোঁ রাজাকে বসাতে হবে।

১৭৯৩ সালের ২৭ আগস্ট তুলোঁ শহরে সাদা পতাকা তুলে দিল তারা। সপ্তদশ লুইকে ফ্রান্সের রাজা বলে ঘোষণা করল। তার পরের দিন, অর্থাৎ ২৮ আগস্ট স্বাগত জানাল ইংল্যান্ড ও স্পেনকে। আসুক ওরা, তুলোঁ বন্দর ওদের সাথে বাণিজ্য করবে। তুলোঁ ওদের বন্ধু। কয়েক দিনের মধ্যেই তুলোঁ বন্দর গিজগিজ করতে লাগল ইংরেজ, স্প্যানিশ আর ইতালীয় সেনাবাহিনীতে। তুলোঁ বন্দরে নোঙর করল ইংল্যান্ড ও স্পেনের জাহাজ।

প্রমাদ গুনল নেপোলিয়ন। তুলোঁ যে পুরোপুরি ইংরেজদের তাঁবে চলে যাচ্ছে! এ কী কাণ্ড! স্বদেশের মাটিতে বিদেশীর আস্ফালন!

তুলোঁ বন্দরকে বিদেশীর হাত থকে উদ্ধারের জন্য নিজেকে কাজে লাগাতে চাইল নেপোলিয়ন। একটা জিনিস সে ঠিকই উপলব্ধি করল যে, যতই দিন যাবে, তুলোঁ বন্দরে বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতির জোর ততই বাড়তে থাকবে। সুতরাং তুলোঁ উদ্ধারের কাজ এখনি শুরু করা উচিত। এতে শুধু তুলোঁরই মঙ্গল হবে না, ফরাসি বিপ্লবকেও বাঁচানো যাবে।

ওপরওয়ালার কাছে আবেদন জানাল নেপোলিয়ন। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। তুলোঁ অভিযানের জন্য তৈরি হল সে। তারিখটা সেপ্টেম্বর মাসের ষোলই।

নেপোলিয়নের মাথার ওপর যে সেনানায়ক ছিল, তার নাম সেনাপতি কার্তু। এর আগেও কার্তুর অধীনে কাজ করেছে নেপোলিয়ন। কার্তুর আস্ফালনে হাসি পেত তার। কী করে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়, কী করে সেনাবাহিনী সাজাতে হয়, কামান সাজাতে হয়, তার কিছুই জানত না কার্তু।

একবার কামানের গোলা ঠিক নিশানায় না-যাওয়ায় কার্তু বিড়বিড় করে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, 'হতভাগারা যত রাজ্যের বাজে বারুদ পাঠিয়েছে—।' নাচতে না জানলে উঠান তো বাঁকা হবেই।

নেপোলিয়নের বেশ মজা লাগত, আবার বিরক্তও হত। যুদ্ধের ব্যাপারে এই ধরনের অভিজ্ঞতা থাকলে চলে? চলে না ঠিকই, তবে নেপোলিয়নের জীবনের পরম লগ্নটা কিন্তু এই সুবাদেই এল। সাত হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

তুলোঁ যুদ্ধে প্রচুর হতাহত হল ইংরেজ আর স্প্যানিয়ার্ডদের। দুর্গ ছাড়তে বাধ্য হল তারা। সেই সাথে তুলোঁ বন্দরে পতন হল ইংরেজ শক্তির।

সেনাপতি কার্তুর পক্ষে যেমন মন্তব্য করা স্বাভাবিক, সে তা-ই করল। 'প্রতিপক্ষের অত কাছে যাওয়াটা ঠিক হয় নি নেপোলিয়নের। এ পক্ষেরও কম লোক মারা যায় নি।'

যুদ্ধ হলে তো যাবেই। তবে জয়ের আনন্দে ভেসে যায় সব দুঃখ, বেদনা। তুলোঁ আক্রমণে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছিল নেপোলিয়ন। কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে মেজর পদে প্রমোশন দিল তাকে।

নেপোলিয়ন আহত হয়েছিল এ যুদ্ধে। বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর বর্শার আঘাতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রচুর রক্ত পড়েছিল। ডাক্তার প্রথম স্থির করল, পা-টা কেটে বাদ দিতে হবে। নইলে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে। নেপোলিয়নকে বাঁচানো যাবে না। কী ভেবে আবার ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করল ডাক্তার। এবার অভিমত দিল, ঠিক আছে, পা-টা কেটে একেবারে বাদ না দিয়ে একটু দেখাই যাক—। কিছুদিন ভুগল নেপোলিয়ন। উরুর ক্ষত একটু বিষিয়ে গেল বটে, তবে সেরে উঠল। তুলোঁর যুদ্ধজয়ের স্বাক্ষর হয়ে রইল বাঁ হাঁটুর ওপর ওই গভীর ক্ষতচিহ্ন।

একেকবার মনে হয়, ডাক্তার যদি দ্বিতীয়বার নেপোলিয়নের আহত জায়গাটা পরীক্ষা না করত, যদি প্রথমবারের সিদ্ধান্তই বহাল রাখত, তাহলে ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস কোন খাতে বইত, কে জানে—

এদিকে স্বদেশভক্তির নামে বড় বাড়াবাড়ি শুরু করল জননিরাপত্তা সমিতি। রক্তলোলুপ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল সমিতির সদস্যরা। এই বুঝি ওই লোকটা অভিজাতদের সাথে একটু বেশি মেলামেশা করছে, দাও ওকে শেষ করে। ওই বুঝি কে ইংরেজদের সাথে তলায় তলায় মিতালি করছে, দাও শেষ করে। লোকটাকে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে, দাও ওকে কবরের দিকে ঠেলে।

নিছক সন্দেহের বশে এই ধরনের কত লোককে যে কারারুদ্ধ করা হল, কত লোককে যে গিলোটিনের তলায় মাথা পাততে হল, তার ঠিক নেই। এই ব্যাপারে না হল কোনো বিচার, না কোনো প্রতিবাদ। তখন প্রতিবাদ করার সাহসই বা কোথায়—

তুলোঁ আক্রমণে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেবার জন্য মেজর পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল নেপোলিয়নকে। এবার জয়ের কৃতিত্ব দেখাবার পুরস্কার হিসেবে পেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদ। মাইনেপত্তর বাড়ল, সেই সাথে সম্মান। লা স্যালি নামে সুন্দর জায়গায়, ছবির মতো একটা বাড়িতে সবাইকে নিয়ে উঠল নেপোলিয়ন। ভাইবোনেরা এর মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বোনদের মধ্যে পলিন বেশ সুন্দরী। কথায়-ব্যবহারে চটুল। পুরুষ ভোলাতে ওস্তাদ।

লা স্যালির সময়টা নেপোলিয়নের জীবনে ছিল বড় সুখের সময়। তবে মাথায় চিন্তার ভারও ছিল যথেষ্ট। কীভাবে ফ্রান্সের চৌহদ্দি থেকে ইংরেজদের তাড়াবে শুধু সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকত। ইংরেজদের ওপর বড় রাগ। জেনারেল পায়োলীর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে কর্সিকা চলে গেছে ইংরেজদের হাতে। এই দুঃখ কি সহজে ভোলা যায়? অমন সাধের জন্মভূমি কিনা শত্রুর হাতে! বড় ইচ্ছে হল কর্সিকাকে ইংরেজদের হাত থেকে উদ্ধার করে। এই ব্যাপারে

খানিকটা যোগাড়যন্ত্রও করল। তবে ব্যাপার-স্যাপার দেখে বুঝতে পারল, কর্সিকা উদ্ধার করা তত সহজ নয়। কার সাধ্য ইংরেজদের নৌশক্তির কাছে দাঁড়ায়! বিশেষ করে ইংরেজরা যখন কর্সিকাকে একটা শক্ত নৌঘাঁটি করার তালে রয়েছে।

নেপোলিয়ন যখন এইসব সাত-পাঁচ ভাবছে, ঠিক সেই সময় তার জীবনে ঘনিয়ে এল বড় বিপদ। একবার নয়, দু-দুবার। মার্শেলে একটা জীর্ণ দুর্গ সংস্কারের জন্য ওপরওয়ালার কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠাল সে। চিঠির শেষে দুটো লাইন জুড়ে দিল, 'দুর্গে কামান ফিট করি, তারপর শহর দখল করতে কতক্ষণ—।' ব্যস, আর যায় কোথায়। ওপরওয়ালা ধরেই নিল নেপোলিয়নের অন্য কানো মতলব আছে। সাথে সাথে সন্দেহের আইনে গ্রেফতার করা হল তাকে। নিজের বাড়িতে অন্তরীণ করা হল। অবশেষে প্রমাণের অভাবে সে যাত্রা ছাড়া পেল।

দু নম্বর বিপদ এল ১৭৯৪ সালের জুলাই মাসে। জেকোবিন দলের নেতা রোবস্‌পীয়েরের ছোট ভাই অগাস্টিন ছিল নেপোলিয়নের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সুবাদে অগাস্টিনকে গোপনে জেনোয়ায় পাঠাল সে ওখানকার সামরিক তথ্য ইত্যাদি খুঁটিনাটি জেনে আসার জন্য। অন্য সময় হলে কিছু হত না। কারো কিছু এসে যেত না। কিন্তু এর মধ্যে তো জামানা আবার পাল্টে গিয়েছিল।

রোবস্‌পীয়ের সন্দেহের আইন প্রয়োগ করে এত লোককে গিলোটিনের তলায় দিয়েছিল যে এবার তার প্রতিক্রিয়া শুরু হল। হবেই তো। মাত্র দু মাসে এক হাজার তিন শ লোক প্রাণ দিয়েছে গিলোটিনে। মৃত্যুর আগে তাদের না হয়েছে বিচার, না শোনা হয়েছে তাদের বক্তব্য। ধীরে ধীরে বিষিয়ে উঠল মানুষের মন। বিষিয়ে উঠল কনভেনশনের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের মন। এবার সবার রাগ গিয়ে পড়ল রোবস্‌পীয়েরের ওপর। বন্দি কর ওকে, মেরে ফেল। ও যেমন করে মানুষের গলা কেটেছে, তেমনি ওরও গলা কেটে ফেল—।

ফল যা হবার তাই হল। গিলোটিনের তলায় মাথা পেতে দিতে বাধ্য হল রোবস্‌পীয়ের। ছোট ভাই অগাস্টিনকেও ওই একই ভাগ্যের সঙ্গী হতে হল।

দুই ভাইয়ের মৃত্যুর পর এবার খোঁজ পড়ল সেইসব লোকদের, যারা এতদিন ওই দুই ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিল। খোঁজ পড়ল নেপোলিয়নের। সে না অগাস্টিনের বন্ধু ছিল? কেন নেপোলিয়ন তাকে জেনোয়ায় পাঠিয়েছিল, অ্যাঁ? কী মতলব ছিল? সন্দেহের আইন তো ধুয়েমুছে যায় নি। সুতরাং ধরা হল নেপোলিয়নকে। তার বিরুদ্ধে এবারের চার্জ, সে নাকি ফ্রান্স থেকে প্রচুর সোনা পাচার করে জেনোয়ার ব্যাংকে জমা রেখেছে। তাই অগাস্টিনের সাথে এত বন্ধুত্ব। এমন লোককে তো সন্দেহ করতেই হবে। অতএব সাসপেন্ড করা হল তাকে। কড়া পাহারায় অন্তরীণ রাখা হল বাড়িতে। দিন গুনতে লাগল নেপোলিয়ন, কবে ডাক পড়বে গিলোটিনের তলায় মাথা পেতে দেবার জন্য ...।

নেপোলিয়ন একটা চিঠি লিখল তার শুভার্থী সলসেটিকে, 'রিপাবলিক ফ্রান্সের জন্য আমি সব দিয়েছি। তুলোঁ অভিযানে আমি প্রাণপণ করেছি। স্বাদেশিকতা আর ন্যায়নীতির আদর্শ থেকে কখনো নিজেকে সরিয়ে নিই নি, আর আজ আমিই কিনা দেশদ্রোহী বলে অভিযুক্ত...?'

নেপোলিয়নের কাগজপত্র সব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হল। অনেক খোঁজখবর হল। তারপর সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে পনের দিন পর মুক্তি পেল সে। সেইসাথে পেল একটা চিঠি। পশ্চিম সেনাবাহিনীতে বদলি করা হয়েছে তাকে।

পছন্দ হল না নেপোলিয়নের। চাকরি হিসেবে ওটা ছিল একটু কম মর্যাদার চাকরি। দ্বিতীয়ত, ওই বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি ক্যাথলিকদের উচ্ছেদ।

অসম্ভব! ফরাসি সেনাপতি হয়ে ফরাসি নিধনে নিয়োজিত হতে পারে না সে। প্যারিসে এসে অন্য কোথাও বদলির আবেদন করল নেপোলিয়ন।

কিন্তু না-মঞ্জুর হল। দুঃখ, হতাশায় ছুটি নিল নেপোলিয়ন। যুক্তি দেখাল, শরীর অসুস্থ। এই সময়টা নেপোলিয়নের জীবন কেটেছে বড় বিশ্রীভাবে, বড় নীরসভাবে। একে চাকরির এই অবস্থা, ওদিকে প্যারিসে থাকা-খাওয়ার খরচ অত্যন্ত বেশি। একে ধরল, ওকে ধরল, কিন্তু বৃথা। কিছুই সুরাহা হল না।

ছুটিশেষে আবার আবেদন করল সে। তাকে যেন ইতালি সীমান্তে বদলি করা হয়। আবেদনের সাথে পীড্‌মন্ট আক্রমণ করার সুন্দর নক্‌শা দিল। কিন্তু দিলে কী হবে, এবারো কর্তৃপক্ষ নেপোলিয়নকে কোনো সামরিক ক্ষেত্রে বদলি না করে প্যারিসের অফিসে কাজ দিল—যে-কাজে না আছে উত্তেজনা, না যুদ্ধ। আছে কেবল কেরানির মতো ঘাড় গুঁজে কাজ করা। সেনাপতি নেপোলিয়নের এ কী হাল—!

ভাবতে লাগল নেপোলিয়ন। একবার ভাবল রুশ রেজিমেন্টে চাকরি নেবে, আবার ভাবল তুর্কির কথা। তুর্কির গোলন্দাজ বাহিনী ছিল দুর্বল। তাকে ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য ওখানে একটা সামরিক মিশন পাঠানোর কথা চলছিল। এ বিষয়ে দু দেশের মধ্যে নানা প্রস্তাবের আদান-প্রদান হচ্ছিল। এই সুযোগে তুর্কি যেতে চাইল নেপোলিয়ন। যাবার ব্যবস্থাও প্রায় ঠিক, এই সময় ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় আবার একটা পরিবর্তন এল। আর এই পরিবর্তনের কর্মসূচি দেখে খুশিই হল নেপোলিয়ন। এবার যেন ফরাসি কর্তৃপক্ষের মাথা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

ঠিক হল, আর গিলোটিনের আঘাত নয়—আর রক্তপাত নয়। এবার থেকে গঠনমূলক কাজ। নইলে ইউরোপের মানচিত্রে অস্তিত্বই থাকবে না ফ্রান্সের।

স্থির হল, পাঁচ জন ডিরেক্টর নিয়ে একটা ডিরেক্টরি সভা হবে। তার অধীনে থাকবে দুই কক্ষবিশিষ্ট একটা আইনসভা। ডিরেক্টরি সভার কর্মধারা হবে বিপ্লবের আদর্শকে আন্তরিকভাবে মেনে চলা।

পরিকল্পনা হল বটে। কিন্তু কত যে মত দেখা গেল, তার ঠিক নেই। বিপ্লবের উগ্রতা কমে যাওয়া মাত্রই বিভিন্ন দল বিভিন্ন সুরে কথা বলতে চাইল। এদের মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক ছিল রয়্যালিস্ট বা রাজ-সমর্থনকারীদের দল, যারা অষ্টাদশ লুইকে তখন সিংহাসনে বসানোর পক্ষপাতী ছিল। এবং সেই ব্যাপারে ইংরেজদের সাহায্য নিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। ওদিকে চরমপন্থীরাও চুপচাপ বসে ছিল না। কিছু একটা করার জন্য তারাও সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠল। মাঝখান থেকে ইংরেজরা এই পারস্পরিক বিবাদে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এগিয়ে এল। ঠিক এই সময়ে নেপোলিয়নকে আহ্বান জানাল ডিরেক্টরি সভার নবনিযুক্ত সেনাপতি পল বারাস।

সভার এক জরুরি অধিবেশনে পল বারাস চাপা গলায় বলল, 'আমার সেনাবাহিনীতে আসবে? তিন মিনিট সময় দিচ্ছি। এক্ষুনি তোমার সিদ্ধান্ত জানাবে।'

রাত তখন গভীর। বাইরে বৃষ্টি, তার সাথে ঝোড়ো হাওয়া...।

মুহূর্তের জন্য ভাবল নেপোলিয়ন। স্বদেশভূমি ও বিপ্লবের আদর্শকে বাঁচানোর জন্য বিপ্লব বিরোধী দেশদ্রোহীদের দমন করার এই হল সুবর্ণক্ষণ। ফ্রান্স তখন নৈরাজ্যের হুঙ্কারে

কাঁপছে। নীতি, অনুশাসন, দেশ গড়ার কর্মসূচি ইত্যাদি কোনোকিছুকেই তখন তথাকথিত রাজানুগতের দল ও কনভেনশনবিরোধী নৈরাজ্যবাদীরা মানছে না। একই দেশের মাটিতে তখন গৃহবিবাদের আগুন জ্বলে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে এসে ধিকিধিকি করছে।

'আমি রাজি।' বলল নেপোলিয়ন।

সত্য কথা বলতে কি, ভাগ্যবলে পল বারাস প্রধান সেনাপতি হলেও সেই যোগ্যতা ছিল না তার। সুতরাং বিরোধীদের দমন করার কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য একজন সুদক্ষ সেনাপতি নিতান্তই দরকার ছিল। আর সেই সুবাদেই ডাক পড়ল নেপোলিয়নের।

'কামানগুলো কোথায়?' দায়িত্ব গ্রহণ করার পর নেপোলিয়নের প্রথম জিজ্ঞাসা।

ভোর ছটার মধ্যেই প্রার্থিত জিনিসপত্র পেয়ে গেল নেপোলিয়ন। এবার আসল কাজের শুরু। ট্যুইলারির প্রাসাদে ছিল কনভেনশন ও ডিরেক্টরি সভার অফিস। ওগুলো আক্রমণ করে বিপ্লবের আদর্শ ও বিপ্লবের সবকিছু নষ্ট করাই ছিল বিরোধী দলের প্রধান উদ্দেশ্য।

গোপনে খবর এল, প্রাসাদের উত্তর দিক থেকে বিরাট একটা বিরোধী দল এগিয়ে আসছে। সশস্ত্র। সংখ্যায় তিরিশ হাজার। প্রমাদ গুনল নেপোলিয়ন। তার সৈন্য সংখ্যা মাত্র আট হাজার।

নেপোলিয়ন অবশ্য সাহস হারাল না। উত্তর দিকে আটটা কামান সাজাল সে। দুটো রইল একবারে রাজপথের ওপর। রচ্ গির্জার দিকে মুখ করে। বুঝতে পেরেছিল সে, বিদ্রোহীদের সাথে একটু পরেই যে-লড়াই হবে, তাতে যদি জিততে হয়, তাহলে কামানের খেল দেখাতে হবে।

উদ্বেগের মধ্যে কেটে গেল সমস্তটা সকাল। বেলা বাড়তে লাগল। ঝিরঝিরিয়ে খানিকটা বৃষ্টিও হয়ে গেল, কিন্তু ওই দলের কোনো সাড়াশব্দই নেই।

সাড়া পাওয়া গেল আরো কিছুক্ষণ পর। ঢোলের ডিমিডিমি, সেইসাথে গোলাগুলির শব্দ। বেলা তখন তিনটা। এগিয়ে এল বিরোধী দল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বারাসের সেনাবাহিনীর ওপর। তীব্র বেগে আক্রমণ চালাল। তাদের বেয়নেটের আঘাতে জর্জরিত হল এ-পক্ষের সেনাবাহিনী। এক সময় অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মনে হল আর বুঝি রক্ষা করা গেল না। না কনভেনশন, না বিপ্লবের আদর্শ—।

আচমকা গর্জে উঠল নেপোলিয়নের কামান। কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল আগুনের প্রাণঘাতী গোলা। গোলাবর্ষণের কোনো বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। এমন অবিরাম গোলাবর্ষণের জন্য তৈরি ছিল না বিরোধীরা। ক্রমশ পিছু হঠতে লাগল তারা। চেষ্টা করল অন্য আরেকটা পথ ধরে ফিরে যেতে। কিন্তু সে-পথেও গর্জে উঠল আগে থেকে সাজিয়ে রাখা কামান। নেপোলিয়ন যেন আগেই জানত, শত্রুরা যখন পিছু হঠবে, কোন পথটা ধরতে চাইবে তারা।

অবশেষে পালাতে শুরু করল বিদ্রোহীরা। পিছু ধাওয়া করল সরকার পক্ষের সৈন্য। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা সর্বনেশে বিদ্রোহকে চুপ করিয়ে দিল নেপোলিয়ন। তার কামান দাগার দুঃসাহসিক কৌশল দেখে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল পল বারাস, 'আমাদের প্রজাতন্ত্রের শাসন এখন নিরাপদ।'

স্টানিসলাস ফ্রেরোন নামে এক সদস্য কনভেনশনের অধিবেশনে বলল, 'আমাদের এই সভার জনপ্রতিনিধিরা যেন সেনাপতি বোনাপার্টকে ভুলে না যায়। তিনি বিপ্লবকে বাঁচিয়েছেন—।'

সোল্লাসে অভিনন্দন জানাল উপস্থিত প্রতিনিধিরা।

দায়িত্ব পেলে এবং সেই দায়িত্ব পালনে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকলে নেপোলিয়নের যোগ্যতা কত দূর উঠতে পারে তার পরিচয় এই প্রথম পাওয়া গেল। সবাই বুঝতে পারল, কামান ব্যবহারে নেপোলিয়ন কত দক্ষ।

১৭৯৫ সালের ২৬ অক্টোবর। জাতীয় সভার শেষ অধিবেশন। পরের দিন থেকে শুরু হচ্ছে ডিরেক্টরি সভার শাসন।

স্থির হল, পল বারাস আর প্রধান সেনাপতি থাকবে না। তার জায়গায় আসবে রিপাবলিক ফ্রান্সের পরিত্রাতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নেপোলিয়নের বয়স তখন ছাব্বিশ।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আবহাওয়ায় নাকি বঙ্গদেশীয় হাওয়ার মিশেল আছে। তাই ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের গায়ের রং ফ্যাকফ্যাকে সাদা নয়। চোখ দুটো নীলিমায় নীল, এতটুকু পিঙ্গল নয়। কালো চুল, কালো ভুরু। মুখ কমনীয় লাবণ্যে ভরা। বিশেষ করে মেয়েদের মুখ।

নেপোলিয়ন পছন্দ করত এমন চেহারার মেয়ে। মেয়ে হবে মেয়েলি—এই ছিল তার মনের কথা। মেয়ের স্বভাব হবে ফুলের পাপড়ির মতো নরম, কথা বলবে ঝরনার সুরে, চলবে-ফিরবে মধুর ছন্দে, যাকে কাছে টানলে শরীর মনে দোলা লাগবে। উষ্ণতার স্বাদে শিরা-উপশিরায় রক্ত লাফিয়ে উঠবে। এই না হলে মেয়ে—?

নেপোলিয়ন যদি জীবনসঙ্গিনী হিসেবে এমন একটা মেয়ে পেত, তাতে ইতিহাসের কী ক্ষতিবৃদ্ধি হত জানি না, তবে হয়তো তার নিজের জীবনের শেষ কটা বছরের চাপা আর্তনাদে আটলান্টিকের ঢেউ উথালপাতাল করত না। স্ত্রী-পুত্রকে শুধু একটু চোখের দেখা দেখবার জন্য শেষ মুহূর্তটাতে অমন ছটফটিয়ে উঠত না।

নেপোলিয়ন জীবনে বেশ কয়েকবারই মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছে। এদের মধ্যে একজন ছিল ক্যারোলিন দ্য কলাম্বিয়ের। নেপোলিয়ন ডাকত এমা নামে। এমা সম্পর্কে সে ছিল উচ্ছ্বসিত। কিন্তু এমা ছিল নির্বিকার, উদাসীন।

নেপোলিয়ন যৌবনের প্রথম স্বাদ পেয়েছিল এক বারবণিতার সাথে শয্যাসুখে। বারবণিতা জেনেও মেয়েটার কালো চুল, গভীর দুটো চোখ আর সর্বোপরি মেয়েলি ভাবটুকু নেপোলিয়নের ভালো লেগেছিল। প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতার বলি এই মেয়েটার দুঃখে-ভরা জীবনকাহিনী শুনে অনুকম্পায় ভরে উঠেছিল নেপোলিয়নের মন।

এর কয়েক বছর পর নেপোলিয়ন পরিচিত হয়েছিল দুই সহোদরার সাথে। বড়টির নাম জুলি—বয়স বাইশ। ছোটটির নাম ইউজিন ডিজায়ারি—বয়স ষোল।

নেপোলিয়নের বেশি ভালো লাগত ডিজায়ারিকে। নিজের মনে বারবার বলত, তুমি আমার কামনা, তুমি আমার কল্পনা।

এমন সময় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্পস্ পর্বত অঞ্চলে পাঠানো হল নেপোলিয়নকে। সেখান থেকে চিঠি লিখত ডিজায়ারিকে। ভালবেসে লিখলেও সে চিঠির ভাষা ছিল ভারিক্কি, গুরুগম্ভীর 'তুমি গান ছেড়ো না—ভালো একজন মাস্টার রাখ—একটা পিয়ানো কেনো—।'

বলা বাহুল্য, ডিজায়ারির হালকা মনে নেপোলিয়নের এই অভিভাবকী চিঠি কোনো মোহ বিস্তার করে নি।

ইতোমধ্যে জুলির সাথে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বড় ভাই জোসেফের। এইবার নিশ্চয়ই নেপোলিয়নের সাথে বিয়ে হবে ডিজায়ারির।

বাড়ি এল নেপোলিয়ন। বিয়ের প্রস্তাব দিতেই নাক কুঁচকে মন্তব্য করল ডিজায়ারির মা, 'পরিবারে একজন বোনাপার্টই যথেষ্ট। দ্বিতীয় বোনাপার্টের আর দরকার নেই।'

মন খারাপ করে কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেল নেপোলিয়ন। তার কিছুদিন পর এক সামরিক অফিসারের সাথে বিয়ে হয়ে গেল ডিজায়ারির।

নেপোলিয়নের জীবনে ডিজায়ারির উপাখ্যান এখানেই শেষ।

ডিজায়ারিকে নেপোলিয়ন ভুলতে পেরেছিল রোজ বোহারনিজের সাথে পরিচিত হয়ে। রোজ বোহারনিজের পিতৃদত্ত নাম ছিল রোজ টাচার বা জোসেফি টাচার।

মার্টিনিক দ্বীপের অধিবাসী ছিল অভিজাত টাচার পরিবার। ভাই নেই। কেবল তিনটা বোন। রোজ সবার বড়। বার বছর বয়সে কনভেন্টে ভর্তি হয় ও। চার বছর ছিল ওখানে। তারপর ফিরে এল বাড়িতে। মা-বাবা রোজের বিয়ে ঠিক করেছে। বরের নাম আলেকজান্ডার বোহারনিজ। ধনী পরিবারের ছেলে। সুপুরুষ। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছেলে হিসেবে বোহারনিজ খারাপ নয়। তবে একটা জায়গায় কিছু গোলমাল ছিল। কোনো সুন্দরী চটুলনয়না মেয়ে দেখলেই মাথাটা কেমন করে উঠত তার।

যাহোক, ষোল বছর বয়সে আলেকজান্ডারকে স্বামী হিসেবে বরণ করল রোজ।

বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর ভালোই কাটল। দুটো সন্তানের মা হল রোজ। প্রথমটা ছেলে, দ্বিতীয়টা মেয়ে। পরিপূর্ণ সংসার করতে লাগল ও।

কিন্তু আর কত দিন...

স্বভাবের পরিচয় দিতে লাগল আলেকজান্ডার। সুন্দরী মেয়েদের পেছনে ঘুরে বেড়ানো। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে নেমে এল এক তিক্ততা। ভেবে দেখল রোজ, যেখানে একবার চিড় খেয়ে গেছে, সেখানে জোড়াতালি না দেয়াই ভালো। তারপর নিজের হাতে গোছানো সংসার ফেলে চলে আসতে বাধ্য হল ও। ওর বয়স তখন সবেমাত্র বাইশ...।

এর পরের কয়েকটা বছর আলেকজান্ডার আর রোজ—দুজনের জীবনই বড় ঝড়ের ইতিহাস। আলেকজান্ডার কারারুদ্ধ হয়ে গিলোটিনে প্রাণ দিল। বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও রোজ অনেক চেষ্টা করেছিল স্বামীকে বাঁচাতে। পারল তো না-ই, উল্টো নিজে কারারুদ্ধ হল। তার নিজের মাথার ওপরই প্রায় নেমে এসেছিল গিলোটিনের খড়্গ। শুধু ত্রাসের নায়ক রোবস্পীয়রের পতন হওয়াতেই দৈববলে বেঁচে গেল রোজ। কারামুক্ত হল।

ফেলে আসা জীবনের সবকিছু ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন জীবন শুরু করল রোজ। মনে হয় কারাগৃহে গিলোটিনের শাণিত আঘাত কল্পনা করে মৃত্যুর যে বিভীষিকা দেখেছিল ও, তা থেকে মুক্তি পেয়ে, নিদারুণ স্মৃতিগুলোকে ভুলবার জন্যই যেন সবকিছুকে রঙিন চোখে দেখতে শুরু করেছিল। আর এই যখন রোজের মনোভাব, ঠিক সেই লগ্নেই এগিয়ে এল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

ক্রমে ঘনিষ্ঠ হল দুজন। এমনি এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে নেপোলিয়ন বলল, 'তোমার রোজ নামটা আমার পছন্দ নয়। আজ থেকে তোমার নাম হবে জোসেফাইন। জোসেফি থেকে জোসেফাইন।'

একটু চুপ থেকে আবার বলল নেপোলিয়ন, 'এবার থেকে তুমি আর রোজ বোহারনিজ নও। এখন থেকে তুমি আমার জোসেফাইন ...।'

এমনিভাবেই কাটল কিছুদিন। একদিন নেপোলিয়নের কানে এল, জোসেফাইন তার সাথে যত মধুর ব্যবহারই করুক না কেন, আসলে সে হল পল বারাসের শয্যাসঙ্গিনী। পল বারাসের নিত্য আসা-যাওয়া জোসেফাইনের বাড়িতে।

মনে কষ্ট পেল নেপোলিয়ন। জোসেফাইনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ছেড়ে দিয়ে কাজে মন দিল।

কিছুদিন কাটল এভাবে। তারপর হঠাৎ একদিন জোসেফাইনের লেখা একটা চিরকুট পেল নেপোলিয়ন : 'তোমাকে আমি এত করে পেতে চাই, অথচ তুমি আসছ না। কালকেই আসবে। দুপুরে একসাথে খাব। এসো কিন্তু...। তোমাকে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি।'

বসন্ত ঋতুর সব কটা রাগরাগিণী সেদিন কী সুর বাজাল নেপোলিয়নের কানে, লাফিয়ে উঠল নেপোলিয়ন। জোসেফাইন ডেকেছে। এ ডাক কি উপেক্ষা করা যায়!

আবার ছুটে গেল নেপোলিয়ন। এবং প্রতিদিনই যেতে লাগল। কী প্রচণ্ড ভালবাসা! কী বল্‌গাহীন আবেগ সেনাপতি নেপোলিয়নের, যোদ্ধা নেপোলিয়নের! মাঝেমধ্যে বিরাট চিঠি লিখত জোসেফাইনের কাছে। আবেগ-ভরা চিঠি। হাসত জোসেফাইন। বলিহারি সেনাপতি! নেপোলিয়ন এবং জোসেফাইনের —দুজনের কাছে জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা ছিল বিপরীত। একজন সৌন্দর্য ও স্নেহ দিয়ে জীবনের মাধুরী খুঁজত, অন্যজন ছিল নেহাতই জৈব ব্যবহারে বিশ্বাসী। সুতরাং ... ভবিষ্যতের পাতায় এই দুজনের মিলনের ইতিহাস কেমন হবে কে জানে...

একদিন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল নেপোলিয়ন। তার যা একটু দ্বিধা মায়ের জন্য। মা কিছুতেই রাজি হবে না একজন বিধবাকে পুত্রবধূ করতে। তাছাড়া যার বাড়িতে বেশকিছু পুরুষের নিত্য আনাগোনা।

যাহোক, মায়ের অমতেই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল বিয়ে। নেপোলিয়নের বয়স তখন ছাব্বিশ, আর রোজের বত্রিশ। দুজনের মধ্যে ছ বছরের ফারাক। তবু নেপোলিয়ন রোজের মধ্যে আবিষ্কার করল একজন নারীকে, যেমনটি সে মনের মাধুরী দিয়ে কল্পনায় গড়ে নিয়েছে। ল্যাটিজিয়া দুঃখিত হল এ বিয়েতে। বিশেষ করে বোন পলিন। নাক কোঁচকাল।

নেপোলিয়ন তার বিবাহিত জীবনে সত্যিকারের একটা মেয়েকে চেয়েছিল। জোসেফাইনের ব্যবহারে, কণ্ঠস্বরে, কথাবার্তায় তাকে পেয়েছিল। তেমনি জোসেফাইনও নিশ্চয়ই তার মনের মতো পুরুষকে স্বামী হিসেবে চেয়েছিল—যে হবে দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, দুর্দান্ত জীবনদর্শনে উচ্ছল। কিন্তু জোসেফাইন যে-পৌরুষযুক্ত পুরুষটি চেয়েছিল, নেপোলিয়ন সে-পুরুষ ছিল না। সে ছিল শান্ত, গম্ভীর। তার কাছে জীবনদর্শনের অর্থ ছিল নীতিগত। এর পরের কয়েকটা বছরে যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করে নেপোলিয়ন খ্যাতি কুড়িয়েছে, সম্মানিত হয়েছে, উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে উন্নীত হয়েছে, তবু জোসেফাইনের মনের মানুষটি হতে পারে নি। গিলোটিনের খাঁড়া থেকে মুক্তি পাবার পর জীবনকে ফেনিল করে তুলতে চেয়েছিল জোসেফাইন। জীবনের পরম অর্থ জোসেফাইন সেখানেই খুঁজেছিল। তাই সে তার জীবনকে বহু বৈচিত্র্যে ভরা নিত্যই নবরূপে মেলে ধরতে চেয়েছিল। নেপোলিয়নের মনের বাসনা অনুযায়ী সাজানো সংসারে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ দীপশিখাটুকু হয়ে টিমটিম করে জ্বলতে চায় নি।

নেপোলিয়নের জীবনে এই বেসুরো ট্র্যাজিডি যদি না বাজত, তাহলে তার বিজয়ের ইতিহাসে ভারসাম্যের অভাব হত না। জীবনের শেষ কটা বছর তার বুকচাপা নীরব কান্না সেন্ট হেলেনার রুক্ষ পাহাড়ে ঘা খেয়ে ফিরত না।

নেপোলিয়নের বিবাহিত জীবন কোনো দিনই শান্তিরসে নিষিক্ত হয় নি।

বিয়ের মাত্র দু দিন পর, ১১ মার্চ নেপোলিয়নকে চলে যেতে হল ইতালি অভিযানে। যুদ্ধ, রাজনীতি—এরা মধুযামিনীর ধার ধারে না।

নেপোলিয়নের ওপর নির্দেশ ছিল প্রথমে আল্পস্ পর্বত পার হয়ে পো নদীর উপত্যকায় পীড্‌মন্ট আর অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করা। মিলানের বিরাট জমিদারিটা কেড়ে নেয়া। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা।

আল্পস্ পবর্ত। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত। এর আগেও দু-একবার চেষ্টা করা হয়েছে আল্পস্ পেরিয়ে উত্তর ইতালি জয় করবার। একবারও সফল হয় নি।

নীস্ শহরে ইতালি অভিযানের প্রধান শিবির স্থাপন করল নেপোলিয়ন। সৈন্যের সংখ্যা একচল্লিশ হাজার পাঁচ শ। বিপ্লবের পরে একটা জাতীয়তা ভাবের জাগরণ হয়েছিল এদের মধ্যে। এদের সাহস ছিল, শক্তি ছিল, ছিল অদম্য উৎসাহ। যেটা ছিল না, তা হল যুদ্ধোপযোগী পোশাক আর উপযুক্ত খাবার। সর্বোপরি ছিল শৃঙ্খলার অভাব—যে অভাব কিনা যুদ্ধে সর্বনাশ ডেকে আনে।

খবর এল, অস্ট্রিয়া আর পীড্‌মন্ট মিলিয়ে সৈন্যসংখ্যা নাকি সাতচল্লিশ হাজার। অর্থাৎ ফরাসি সেনাবাহিনী থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বেশি। আরো খবর এল, আল্পসের ওদিকে পীড্‌মন্ট অতি সুরক্ষিত। তাছাড়া আল্পস্ পর্বতের ভেতর দিয়ে যে সরু উপত্যকা পথগুলো গেছে, সেসব এমনভাবে শত্রুসেনারা পাহারা দিচ্ছে যে এ-পক্ষের একটা মাছিও নাকি গলে যেতে পারবে না।

যেতে পারবে না তো পারবে না। ওই পথ দিয়ে যাবার ইচ্ছেও নেই নেপোলিয়নের। সে চিন্তা করছিল অন্য পথের। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে যে-পথ গেছে, সেই পথ। যোদ্ধা হিসেবে যে কটা গুণ থাকা দরকার তার সব কটাই ছিল তার। এছাড়া আরেকটা বিষয়ের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিত সে। সেটা হল ভৌগোলিক জ্ঞান। অর্থাৎ যে-দেশে, যেখানে যুদ্ধ, তার চারপাশের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে সবকিছু খুঁটিয়ে জানা। কোথায় নদী, নালা, খাল, বিল, কোথায় পর্বত, উপত্যকা আর কোথায়ই-বা রাস্তাঘাট, লোকালয়। এই জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে কীভাবে সেনাপতি তার সেনাবাহিনীকে এগিয়ে চলার নির্দেশ দেবে!

অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিল বোলোঁ। অভিজ্ঞ, খ্যাতিসম্পন্ন। বোলোঁর গতিবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল নেপোলিয়ন। আর সচেতন ছিল বলেই তার প্রথম থেকে চেষ্টা ছিল যাতে অস্ট্রিয়ার বাহিনীর সাথে কিছুতেই পীড্‌মন্ট বাহিনী না মিলতে পারে। এজন্য নিজের সেনাবাহিনীকে সুন্দর তিনটা দলে ভাগ করল সে। তিন জন সুদক্ষ সেনাপতির ওপর তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিল। দুজনকে নির্দেশ দিল ঝটিকা বেগে বোলোঁর সেনাবাহিনীকে একযোগে আঘাত করতে। আর অন্য দলটাকে পাঠানো হল পীড্‌মন্টের সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে।

নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিল নেপোলিয়ন। আশ্চর্য শুভ ফল পাওয়া গেল যুদ্ধে। হাজারখানেক সৈন্য মারা গেল অস্ট্রিয়া বাহিনীর । বন্দি হল প্রায় আড়াই হাজার। ইতালি অভিযানে নেপোলিয়নের এই প্রথম জয়।

ওদিকে পীড্‌মন্ট আক্রমণের খবরও ভালো। নেপোলিয়ন নিজেও এগিয়ে গেল সেদিকে। প্রচণ্ড আঘাত হানল। আক্রমণটা এত আচমকা হয়েছিল যে হকচকিয়ে গেল পীড্‌মন্ট বাহিনী।

অস্ট্রিয়ার সাহায্য চেয়েও ব্যর্থ হল তারা। অস্ট্রিয়া তো আগেই কুপোকাত।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধি, দ্রুত সিদ্ধান্ত, বিদ্যুৎগতি সাফল্যের যে কত বড় চাবিকাঠি, ইতালি অভিযানে নেপোলিয়ন সেটা প্রথম থেকেই প্রমাণ করতে লাগল।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয়। আর তার সাথে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম। কখনো খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠা, কখনো সরু গিরিখাত দিয়ে চলা—এমনি করে টানা ছিয়ানব্বই ঘণ্টা ধরে এগিয়ে চলল ফরাসি বাহিনী। আর মাত্র কয়েক মাইল দূরে পীড্‌মন্টের রাজধানী তুরিন। মাঝখানে শুধু একটা নদী—স্টুরা। ব্যস, তার পরই পীড্‌মন্টের পতন। নেপোলিয়ন যেন লাফিয়ে চলল। তার দ্রুতগতি ধাঁধার সৃষ্টি করল শত্রুপক্ষের চোখে। যুদ্ধ হয়, তার বাজনা বাজে, সৈন্যরা তালে তালে মার্চ করে এগিয়ে যায়, দেখেশুনে পরিখা খোঁড়া হয়, কামানে বারুদ গাদা হয়—তবে তো যুদ্ধের শুরু! তা নয়, নেপোলিয়ন এগিয়ে আসছে, এই খবরটা কানে আসতেই দেখা গেল সে কেল্লাফতে করে বসে রয়েছে। নেপোলিয়নের পিঠে কি পাখা গজিয়েছে নাকি!

মালগ্রেভের মতো দুর্গটাও যখন নেপোলিয়নের হাতে চলে গেল, তুরিন প্রাসাদ থেকে তখন ভিক্টর এমেদিউজ সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠাল।

২৭ এপ্রিল রাতে সলিয়র আর কোস্টা নামে দুজন দূত এসে দেখা করল নেপোলিয়নের সাথে।

নেপোলিয়ন বলল, 'আপনাদের রাজাকে বলুন, সন্ধি করতে রাজি আমি, তবে কুনিও তুলে দিতে হবে আমাদের হাতে।'

চমকে উঠল সলিয়র আর কোস্টা। লোকটা বলে কী! কুনিও দিয়ে দেওয়া মানে তো আলপাইন অঞ্চলে প্রবেশদ্বারের চাবি দিয়ে দেওয়া। আর নেপোলিয়ন যদি একবার আলপাইন দখল করে নেয়, তাহলে আর রইল কী?

ওদের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল নেপোলিয়ন। তারপর পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বলল, 'একটা বাজে। কুনিও না পেলে আমার নির্দেশে কাল সকাল থেকে আবার আক্রমণ চলবে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সলিয়র আর কোস্টা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমরা চুক্তিপত্রে সই করতে রাজি। কুনিও আর আমাদের থাকবে না ...।'

নেপোলিয়ন এবার তৈরি হল পো নদী পার হবার জন্য। বুলোঁ দখল করতে হবে। অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে একটু শক্তহাতে জব্দ করা দরকার।

পো নদীর বিশালতা দেখে চমকে উঠল ফরাসি সৈন্যরা। কিছুটা সময় থমকে দাঁড়িয়ে রইল। নেপোলিয়ন সুস্থ মাথায় আছে তো? পো নদী পার হওয়া কি একটা নর্দমা ডিঙানো...? অন্তত দু মাস লাগবে এপারের প্রতিটা সৈন্যকে ওপারে নিয়ে যেতে।

জাঁলেন্‌স নামে এক ছোকরা অফিসারকে ডেকে পাঠাল নেপোলিয়ন। সাহসী, উৎসাহী এই ছেলেটাকে ন শ সৈন্য নিয়ে নদী পার হতে বলল সে। 'নৌকা করে চলে যাও। ওপারে গিয়ে দাঁড়াবার মতো শক্ত একটা সেতুমুখ তৈরি কর। আমরা তোমাদের পেছন পেছন যাচ্ছি—।'

ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছিল নেপোলিয়ন। শত্রুর গোলা উপেক্ষা করে ওপারে পৌঁছাল জাঁলেন্‌স। একটা সেতুমুখ তৈরি করে ফেলল। মাত্র দুদিনে নেপোলিয়ন তার সেনাবাহিনী নিয়ে ওপারে চলে গেল।

সৈন্যদের মধ্যে একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও উৎসাহের সঞ্চার হল।

এর পরের কাজ আরো কঠিন। আদ্দা নামে খরস্রোতা আরেকটা নদী পার হতে হবে। তারপর মিলান অধিকারের মহা অভিযান।

আদ্দা নদীর এপারে লোদী নামে একটা ছোট্ট শহর। সেখান থেকে একটা কাঠের সেতু চলে গেছে নদীর উপর দিয়ে। ওই সেতুটা দখল করতে পারলেই অস্ট্রিয়াকে জব্দ করা যাবে। দেখতে অতি সাধারণ একটা কাঠের সেতু। অথচ পাহারা দিচ্ছে বার হাজার সৈন্য আর ষোলটা কামান।

১০ মে। দুপুরবেলা। নেপোলিয়ন একা ঢুকল লোদী শহরে। একটা মূর্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে সেতুটা ভালো করে লক্ষ করল। সামান্য একটা সেতু। বার ফুটের মতো চওড়া। দুপাশে রেলিং নেই। লম্বায় বড় জোর দু শ গজ। তাকেই রক্ষা করার জন্য ওপারে একটা পুরোনো কেল্লাকে অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা কীভাবে কামান দিয়ে সাজিয়েছে!

ঠিক করল নেপোলিয়ন, ওই সেতু আক্রমণ করতে হবে। আঘাত হানতে হবে পাহারাদার সৈন্যদের। নানা কথাবার্তা উঠল এ নিয়ে। সেনাপতিরা মন্তব্য করল, 'পাগল! এ কখনো হয়?'

নেপোলিয়ন কিন্তু তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইল। ঘোর সন্ধ্যায় বেজে উঠল ব্যান্ড। সেতুমুখ থেকে মুহুর্মুহু আগুনের গোলা ছুটতে লাগল অস্ট্রীয় বাহিনীর দিকে। আর সেই আগুনের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল ফরাসি বাহিনী। সেতু পার হতেই হবে। সাদা একটা ঘোড়ার পিঠ থেকে চিৎকার করতে লাগল নেপোলিয়ন, 'রিপাবলিক ফ্রান্সের জয় হোক এগিয়ে যাও তোমরা ...।'

কেল্লা থেকে সবকিছু দেখেশুনে থ' হয়ে গেল অস্ট্রীয় সৈন্যরা। মুখে রা নেই কারো। কী অদম্য উৎসাহে ফরাসি সৈন্যরা ছুটে আসছে মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরতে। আশ্চর্য! ওরা কি নেপোলিয়নের নির্দেশে মৃত্যুকে পর্যন্ত ভয় করতে ভুলে গেছে! ওই তো কাঠের সেতু। সৈন্যরা ছুটছে। অস্ট্রিয়ানরা ঘন ঘন গোলাবর্ষণ করছে, সৈন্য মরছে, পানিতে পড়ে যাচ্ছে, তবু আসছে।

ওপারে পৌঁছতে যখন পঞ্চাশ গজের মতো বাকি, তখন নেপোলিয়নের নির্দেশে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যরা। উদ্দেশ্য, বাকিটুকু সাঁতার কেটে ওপারে ওঠা।

হঠাৎ অস্ট্রিয়ার সেনাপতিদের দৃষ্টি পড়ল পানির ওপর। অন্ধকারে পানি সাঁতরে তীরের দিকে একে একে উঠে আসছে কারা! ফরাসি সৈন্যরা? ওরা তো একটু আগেও ছিল সেতুর ওপর! কখন শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে নদীতে ঝাঁপাল? আর এদিকে কিনা শূন্য সেতুর ওপর কামান দেগে বারুদ নষ্ট করা হচ্ছে!

ওপারে উঠেই পাশ থেকে আক্রমণ করল ফরাসি বাহিনী। এপার থেকেও অবিরাম ছুটে যাচ্ছে মরণঘাতী গোলা। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল অস্ট্রীয় সৈন্যরা। কোনদিক সামলাবে তারা। নিজেদের জান বাঁচাবে, না সেতু রক্ষা করবে, নাকি সাঁতার কেটে উঠে আসা সৈন্যদের বাধা দেবে। কোনোটাই হল না শেষ পর্যন্ত। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল আস্ট্রিয়ার অত গর্বের সেনাবাহিনী। পেছনে পড়ে রইল তিন শ পঁয়ত্রিশ জনের মতো হতাহত সৈনিক। বন্দি হল এক হাজার সাত শ।

লোদীর এই দুঃসাহসিক যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার মিলান শহরে পৌঁছল নেপোলিয়ন। মিলানের গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠল। অধিবাসীরা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে বিজয়ী সেনাপতিকে দেখল, হাত নাড়ল।

মিলানের রাজপ্রাসাদে গিয়ে উঠল নেপোলিয়ন। কেননা অস্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক সেখান থেকে ইতোমধ্যে পালিয়ে গেছে।

এক ভোজসভায় বক্তৃতা করল নেপোলিয়ন 'মিলানের অধিবাসীরা আমাদের বন্ধু। ফরাসি বন্ধুত্বে কখনো বিশ্বাসের অভাব হবে না।'

ডিরেক্টরি সভার কাছে চিঠি লিখল নেপোলিয়ন : 'মিলান, প্যাভিয়া, কোমো আর লম্বার্ডি অঞ্চলের সব জায়গায় ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা উড়ছে—।'

পীড্‌মন্টের সাথে শান্তি স্থাপন আর মিলান জয় নেপোলিয়নের জীবনে এক বিরাট অভিলাষ পূর্ণ করল। এবার আরেকটা আকাঙ্ক্ষা—অস্ট্রিয়া জয়।

কয়েক দিন পর ডিরেক্টরি সভার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল নেপোলিয়ন। চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। যুদ্ধে অমন সাফল্যের পর ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে এই প্রতিদান!

চিঠিটাতে লেখা ছিল, এতদিন পর্যন্ত নেপোলিয়ন একাই ছিল আল্পস্ সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। এখন থেকে এই পদে নেপোলিয়ন আর একা থাকবে না। তার সাথে আরো একজন থাকবে—সে সেনাপতি কেলারম্যান।

অবাক হল নেপোলিয়ন। হঠাৎ ডিরেক্টরি সভা তার একক নেতৃত্বে অবিশ্বাসী হল কেন, যার ফলে কিনা কেলারম্যানের মতো একষট্টি বছরের একজন বুড়ো সেনাপতিকে তার সাথে দেওয়া হচ্ছে? হতে পারে কেলারম্যান নানা যুদ্ধে অভিজ্ঞ। কিন্তু যে-দ্রুত সিদ্ধান্তের জোরে, যে-ত্বরিত অভিযানের ফলে নেপোলিয়ন তার অর্ধাহারে পীড়িত সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, কেলারম্যান তো সেখানেই বাধা দেবে। তাছাড়া কেলারম্যান যেহেতু বয়সে বড়, এবং নিজেকে ইউরোপের সেরা সেনাপতি বলে মনে করে, সেহেতু সে কিছুতেই নেপোলিয়নের কোনো নির্দেশ বা সিদ্ধান্তে কান দেবে না। কেলারম্যানের অহমিকাই নেপোলিয়নের সব ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

রেগেমেগে অথচ যুক্তি দিয়ে ডিরেক্টরি সভাকে একটা চিঠি লিখল নেপোলিয়ন 'যুদ্ধ জয় গায়ের জোরের ব্যাপার নয়, কৌশল, নিয়মনীতির ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে দুজন সর্বাধিনায়কের ঠোকাঠুকিতে বিপদ ঘটবে। আমি এভাবে কাজ করতে পারব না—।'

নেপোলিয়নের এই চিঠি পেয়ে প্রমাদ গুনল ডিরেক্টরি সভা। লোদীর যুদ্ধে বিজয়ী নেপোলিয়ন যদি এখন বেঁকে বসে, তা হলে মহামুশকিল। কারণ খবর পাওয়া গেছে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির মিলিত এক বিরাট বাহিনী এগিয়ে আসছে সেনাপতি উরম্‌সারের নেতৃত্বে। এই সেনাবাহিনীকে ঠেকাতে নেপোলিয়ন ছাড়া আর যোগ্যতর কে আছে...।

ডিরেক্টরি সভার সিদ্ধান্ত হল নেপোলিয়ন একাই ইতালি অভিযানে সর্বাধিনায়ক থাকবে। খুশি হল নেপোলিয়ন। এবার দেখাতে লাগল যুদ্ধের খেলা। হিসেব করে দেখল উরম্‌সারের আসতে আর কদিন লাগবে। কারণ তার আসার আগেই শেষ করতে হবে এদিকের খেলা।

সত্যি খেলা দেখাল নেপোলিয়ন। পোপের রাজ্য-সীমানায় এসে ঝাঁ করে ফ্লোরেন্সে ঢুকল। ইংরেজদের হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল লেগহর্ন। প্রচুর সোনাদানা পেল সেখানে। ইংরেজদের জাহাজ আটকে ফেলল। এমনকি লেগহর্নে পাঁচ শর মতো যে কর্সিকান ছিল তাদের দিয়ে একটা বিশেষ বাহিনী তৈরি করে তাদেরই সাহায্যে কর্সিকাকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করল। ফরাসি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করল তাকে।

এরপর দু সপ্তাহে তিন শ মাইলের মতো পাড়ি দিয়ে গোটা মধ্য-ইতালি জয় করে ফেলল। এখানেও পাওয়া গেল প্রচুর সোনাদানা। নগদ পাওয়া গেল কোটি কোটি টাকা।

একদিকে এই কাজ করছে নেপোলিয়ন, অন্যদিকে ঠিক খেয়াল রাখছে উরম্সার কোথায় যাচ্ছে, কত দূর যাচ্ছে। ফলে উরম্সার যদিও পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এল, কিন্তু ক্যাসটিগ্লিওন বলে একটা জায়গায় নেপোলিয়নের হাতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। ধাক্কা খেয়ে চলে গেল রোভারডো। তারপর বাসানো। কিন্তু কোনো জায়গাতেই তাল সামলাতে পারল না সে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

দু মাস পরেই আলভিন্জি নামে এক সেনাপতির অধিনায়কত্বে আবার নতুন এক অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল নেপোলিয়নের যুদ্ধক্লান্ত সেনাবাহিনীর ওপর। যুদ্ধ হল আরকোলায়। জয়ী হল নেপোলিয়ন। এই যুদ্ধে তার যুদ্ধ-পরিচালনায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। খুশি হল ডিরেক্টররা। যুদ্ধে তো জয় হয়েছেই, তার ওপর নেপোলিয়ন সোনা এনেছে কত! এও বড় কম কথা নয়। কিন্তু যতই হোক, নেপোলিয়নের হাবভাব কিন্তু ডিরেক্টরদের কাছে ভালো ঠেকল না। প্রথম থেকেই কেমন যেন একটু অবাধ্য, একগুঁয়ে ভাব। যেন আমিই আমার কাজ বুঝব। খবরদার, কেউ যেন নাক না গলায়। কেউ যেন আমার কাজে কথা বলতে না আসে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিরক্ত হওয়া বাজে কথা। আসলে ডিরেক্টররা ভয় পেয়েছিল। কী জানি, যুদ্ধের খেল দেখিয়ে নেপোলিয়ন আকাঙ্ক্ষার কোন মগডালে উঠতে চাইছে।

ডিরেক্টরদের নির্দেশে হেনরি ক্লার্ক বলে এক গোয়েন্দা পাঠানো হয় নেপোলিয়ন সম্পর্কে সব জানার জন্য। অনেক কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পরও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেবার মতো কিছু পেল না ক্লার্ক।

একটু নিশ্চিন্ত হল ডিরেক্টররা। যাক, আপাতত নেপোলিয়নের দিক থেকে কোনো ভয়ের কারণ নেই।

খবর এল, আটাশ হাজার সৈন্য নিয়ে আবার এগিয়ে আসছে অস্ট্রিয়ার সেনাপতি আলভিন্জি। আর অন্যদিক থেকে সতের হাজারের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে সেনাপতি প্রোভেরা। দু দলেরই লক্ষ্য বদ্ধ-জলভূমি-ঘেরা মান্টুয়া, যেখানে নেপোলিয়নের আক্রমণে কুড়ি হাজার অস্ট্রীয় সৈন্য আটকা পড়েছে। তাদের ঘিরে রেখেছে ফরাসি সৈন্য। আটক সৈন্যরা খিদে মেটানোর জন্য ঘোড়ার মাংস খেয়ে কোনোমতে ধুঁকছে আর দিন গুনছে। তাদের উদ্ধার করতেই হবে।

নেপোলিয়নকে আক্রমণ করার এই তো সুযোগ। যতই কেন মান্টুয়াকে অবরোধ করে রাখুক, নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা কিন্তু অনেক কমে গেছে। তার ওপর তার প্রচুর সৈন্য জ্বরে অসুস্থ। কিছু রয়েছে আবার আরকোলাতে। নেপোলিয়নের রয়েছে কুড়ি হাজার সৈন্য, আর আলভিন্জি প্রোভেরার সৈন্যসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ হাজার। সুবর্ণ মুহূর্ত আর কাকে বলে! এই সুযোগেই ঘায়েল করতে হবে নেপোলিয়ন নামে দুর্দান্ত সেনাপতিটাকে।

নিজের সেনাবাহিনীর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে প্রথমে আলভিন্জির সৈন্যদলকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল নেপোলিয়ন। রিভোলি নামক একটা মালভূমি বেছে নিল সে। যুদ্ধের দিক থেকে জায়গাটা অপূর্ব। দুদিকে খাড়া পাহাড়। কোনো যুদ্ধের সাফল্যের পেছনে এই ভৌগোলিক গুরুত্ব যে কতখানি সেটা নেপোলিয়ন যতটা বুঝেছিল, ওই যুগে অমন কেউ বুঝত না।

শুরু হল যুদ্ধ। ভয়াবহ যুদ্ধ। প্রথমটায় নেপোলিয়ন একটু বেকায়দায় পড়লেও পরে শুধু বিদ্যুৎগতিতে একের পর এক শত্রুসৈন্য ঘায়েল করতে লাগল। আধুনিক কায়দায়

'ব্লিৎজক্রিগ' বা আকস্মিক আক্রমণ বোধ করি ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়ন প্রথম দেখাল। পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করল অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা। আট হাজার বন্দি হল ফরাসিদের হাতে।

এবার শত্রু-সেনাপতি প্রোভেরার পালা। প্রোভেরা যুদ্ধে তো হেরে গেলই, এছাড়া সতের হাজার সেনাবাহিনীর প্রায় সম্পূর্ণই বন্দি হল নেপোলিয়নের হাতে।

আর উরম্সার? সেনাপতি উরম্সার—যে কিনা আসলে ফরাসি হয়েও যোগ দিয়েছিল অস্ট্রিয়ার দলে, তাদের হয়েই মহাবিক্রমে এগিয়ে এসেছিল নেপোলিয়নকে শেষ করে দিতে—তার কী হল? সে ওই মান্টুয়াতেই একেবারে জাঁতিকলে ধরা পড়ল নেপোলিয়নের কাছে। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

ডিরেক্টরি সভা থেকে নির্দেশ এল, উরম্সারকে যেন গুলি করে মেরে ফেলা হয়। দেশদ্রোহীর এটাই একমাত্র শাস্তি। এই আদেশ মানল না নেপোলিয়ন। হলই-বা শত্রু । কিন্তু তার বীরত্ব, সাহসিকতা, যুদ্ধকৌশল দেখে তো মুগ্ধ হতে হয়। এসব গুণের কি কদর নেই? সেবার নেহাতই নেপোলিয়নের মহত্ত্ববলে উরম্সার অস্ট্রীয়ায় ফিরে যেতে পেরেছিল।

ইতালিতে নেপোলিয়নের হাতে অস্ট্রীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে চমকে উঠল গোটা ইউরোপ।

নেপোলিয়নের ইচ্ছে ছিল সে একটানা চলে যাবে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দিকে। জয়ের পর জয় লাভ করে সেখানে যেতে বাধা কোথায়? কিন্তু বাধা একটা এল। বাধা এল পোপ পায়াস-এর একটা ঘোষণার পর। রিপাবলিক ফ্রান্সের জন্ম থেকেই ফরাসিদের ওপর চটে ছিলেন মহামান্য পোপ। ফরাসি বিপ্লবের এ কেমনতর শিক্ষা যে, ঈশ্বরের মহিমাকে আগে স্থান না দিয়ে জনতার দাবিকে আগে স্বীকার করে! চার্চের দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মঙ্গলসাধন করতে চায়! যত সব বিধর্মী বেয়াদবের দল। যারা যাজক আর সাধারণ লোকগুলোকে এক শ্রেণীতে ফেলে সমান দেখাতে চায়, ঈশ্বর তাদের একবার দেখে নেবেন। দূর হোক ফরাসি বিপ্লব আর রিপাবলিক ফরাসি দেশ। আমার অস্ট্রিয়াই ভালো। অস্ট্রিয়াই আমার রাজ্যপাট রক্ষা করবে। পোপ যদিও নেপোলিয়নের হাতে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের কথা শুনেছেন, তবুও তিনি দম্ভের সাথে ঘোষণা করলেন যে, ফরাসিদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যদি কেউ আশ্রয় চায় তো রোমের দরজা তার জন্য খোলা রইল...।

এই ঘোষণায় অর্থাৎ পোপের প্রকাশ্য ফরাসি বিরোধিতায় নেপোলিয়ন ভিয়েনা অভিযান স্থগিত রেখে পোপের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল। পোপের রাজ্যের প্রায় একে একে সব কটা অংশ খসে পড়ল নেপোলিয়নের হাতে। বাধা পেল অতি সামান্য। এবার পোপের সাথে একটা চুক্তি করা দরকার। ওদিকে ডিরেক্টরদের মধ্যে একজন বলে বসল, পোপের সাথে আবার চুক্তি-টুক্তি কী? পোপ বলে কেউ থাকবে না। পোপের রাজত্ব এখানেই শেষ। নেপোলিয়ন অবশ্য সাত-পাঁচ এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওই ঊনসত্তর বছরের বৃদ্ধ পোপ সম্পর্কে অতটা কড়া হল না। কারণ নেপোলিয়ন জানত, ইতালিতে পোপের সরকারের অবসান মানেই অন্যান্য রাজকীয় ভাগীদারদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। সে আবার এক উটকো বিপদ হবে। তার চাইতে ভদ্রগোছের একটা চুক্তি করে পোপকে হাতের মুঠোয় রাখা ভালো। তাই হল, পোপের সাথে চুক্তি করে তাঁর কাছ থেকে বোলোগনা, ফেরারা আর রোমাগনা জায়গা কটা নিয়ে নিল নেপোলিয়ন।

এরপর অস্ট্রিয়ার দিকে ছুটল সে। শীতকাল। পুরু করে বরফ পড়েছে। এটুকু গ্রাহ্য করবার কিছু নেই। স্বভাবমতো দ্রুতগতিতে আক্রমণ করল অস্ট্রীয় সেনাবাহিনীকে। প্রথমেই জয় করল লিওবেন, তারপর সোজা গিয়ে হাজির হল ভিয়েনার দোরগোড়ায়। ভিয়েনা তো একেবারে থ'। কে জানত এমন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসবে নেপোলিয়ন। ভিয়েনায় তখন সৈন্য কোথায়? তারা তো সব চলে গেছে রাইন অঞ্চলে। এখন? উপায় নেই। অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস ভয় পেয়ে তার ছেলেমেয়েদের হাঙ্গেরিতে পাঠিয়ে দিল, এর মধ্যে একজন ছিল মারী লুইজা। ফুটফুটে পুতুলের মতো মেয়ে। সেদিন কে জানত কয়েক বছর পরে নেপোলিয়নের জীবনে কোন বাঁধনে আবদ্ধ হবে মেয়েটা—!

অস্ট্রিয়ার সাথে লিওবেনের চুক্তি করল নেপোলিয়ন। চুক্তি অনুযায়ী ডাচি অব মিলান বা মিলানের প্রকাণ্ড জমিদারিটা এসে গেল ফ্রান্সের হাতে। ঠিক হল, এবার ফ্রান্স–অস্ট্রিয়া আর শত্রু নয়। এবার থেকে তাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক, নিগূঢ় বন্ধুত্ব ...।

এই চুক্তির পর ইতালি অভিযান সম্পূর্ণ হল, সার্থক হল নেপোলিয়নের। ইতালিতে এত সার্থক অভিযান এর আগে ফ্রান্সের ইতিহাসে কখনো ঘটে নি, নেপোলিয়নের মতো এমন কৃতিত্বের স্বাক্ষরও এর আগে কেউ রাখতে পারে নি। নেপোলিয়ন যুদ্ধ করেছে তার সৈন্যসংখ্যার অন্তত চার গুণ বেশি শত্রুসেনার সাথে। অন্তত বারটা বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছে সে। তেতাল্লিশ হাজারের মতো শত্রুসেনা নিহত, আহত এবং বন্দি হয়েছে। কামান দখল করেছে এগার শ। এমন জয় সত্যি এর আগে হয় নি।

নেপোলিয়নের যখন এত জয়জয়কার, তাকে ঘিরে এত কোলাহল, এর মধ্যে তার সদ্য–পরিণীতা স্ত্রীর খবর কী—। নেপোলিয়ন যখন আল্পস্ পর্বত পার হতে যাচ্ছে, যখন লোদীর যুদ্ধে সেই ভয়ঙ্কর গোলাগুলির সামনে রয়েছে, যখন ভিয়েনার দিকে ছুটে যাচ্ছে, তখন কি তার ব্যস্ত মনে জোসেফাইনের কোনো স্থান ছিল না?

ছিল বই কী। এক মুহূর্তের জন্যও নেপোলিয়ন তার মন থেকে জোসেফাইনকে মুছে ফেলতে পারে নি। ওই ভয়াবহ যুদ্ধ–শিবির থেকে স্ত্রীকে লিখত আমার গোটা বুকটা জুড়ে বসে রয়েছ তুমি ...আমার চিন্তায়, ধ্যানে, ...আমার সর্বকাজে। ইচ্ছে হয় ছুটে চলে যাই তোমার কাছে।'

চিঠির জবাব আসত। তবে অনেক দেরিতে। তাও আবার মাত্র দু–এক বারই চিঠির জবাব দিয়েছে জোসেফাইন। না দিলে অভদ্রতা হবে, তাই। আর সেই চিঠি পেয়ে নেপোলিয়ন তার প্রতিটা লাইন আঁতিপাঁতি করে খুঁজে পেতে চাইত দূরে–থাকা প্রিয়তমা স্ত্রীর বুক–ভরা উষ্ণতা, যুদ্ধরত স্বামীর জন্য স্ত্রীর উদ্বেগ, তার প্রীতি ও শুভেচ্ছা...।

নেপোলিয়নের বুক ভেঙে যেত স্ত্রীর শুকনো চিঠিতে। মাঝেমধ্যে নিজেকে সান্ত্বনা দিত, নিশ্চয়ই জোসেফাইন অসুস্থ, নইলে চিঠির জবাব দেবে না কেন। আবার কখনো–বা আক্ষেপ করে নিজের মনে মনে বলত, 'বড় নিষ্ঠুর তুমি, জোসেফাইন। পাথরের মতো কঠিন তোমার মন। তোমার অদর্শনে আমার বুকভরা ভালবাসা যে সীমাহীন হয়ে উঠেছে ...।'

নেপোলিয়নের রাগ আর অভিমান–ভরা চিঠিতে কোনো কাজই হল না। হবে কী করে। জোসেফাইন তো তখন হিপ্পোলাইট নামে এক সাধারণ সেনাপতিকে মনপ্রাণ সঁপে বসে রয়েছে। হিপ্পোলাইট স্মার্ট পুরুষ। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। গায়ের রং তামাটে। নীল চোখ,

কুচকুচে কালো চুল। সুদর্শন। যেমন জামাকাপড়ের পারিপাট্য, তেমনি চুল আঁচড়ানোর স্টাইল। তাছাড়া কী হাসিখুশি! নিজে হাসে, অপরকে হাসায়। যখন যেখানে থাকে, জমিয়ে রাখে। বারবার ঘড়ি দেখে না। বারবার জানিয়ে দেয় না, 'জান, আমি সেনাপতি, যুদ্ধ করি—।' জোসেফাইন যখন এসব ভাবে, আঁতকে ওঠে। হিপ্পোলাইটের সবকিছুকে প্রশংসা করে। জোসেফাইনকেও দারুণ পছন্দ করে হিপ্পোলাইট। তার পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজবার ঢং দেখে উল্লসিত হয়।

এই তো রীতি। মেয়েরা সাজবে, পুরুষেরা মুগ্ধ হয়ে দেখবে। তারিফ করবে। তা নয়, কেবল বই পড়, বড় বড় কথা নিয়ে আলোচনা কর, দার্শনিক হয়ে যাও—যত্ত সব। এর চাইতে হিপ্পোলাইট ভালো। সহজ-সাধারণ মানুষ।

তাই মধুযামিনী অসমাপ্ত রেখে বিয়ের দুদিন পরই স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটা জোসেফাইনের একেবারেই পছন্দ হয় নি। সুতরাং হিপ্পোলাইট উপযুক্ত সঙ্গী। জোসেফাইনের সাধ্য কী নেপোলিয়নের মনের নাগাল পায়। ফলে নেপোলিয়নও কোনোদিন জোসেফাইনের মনের নাগাল পায় নি। নেপোলিয়নের উচ্ছ্বাস-ফেনিল ভালবাসা, আবার সেইসাথে তার কর্মময় জীবনের সহ-অবস্থান জোসেফাইন বোধহয় নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে নি। তাই নেপোলিয়ন যখন জোসেফাইনের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিত, জোসেফাইনের ব্যবহার হত শীতল, নির্লিপ্ত। তাদের বিবাহিত জীবন সর্বাঙ্গমধুর ছিল বলা যায় না।

ইতালি আর অস্ট্রিয়া অভিযান শেষে বাড়ি ফিরল নেপোলিয়ন। জোসেফাইনের সাথে মিলিত হল। আশ্চর্য, জোসেফাইন সম্পর্কে সে এত বেশি মোহমুগ্ধ ছিল যে, জোসেফাইনের হাবভাব, হিপ্পোলাইটের প্রতি অনুরাগ ভালবাসা কিছুই ধরা পড়ল না তার চোখে। ভালবাসার উচ্ছ্বাসে জোসেফাইনের আসল চেহারাটা দেখতে ভুল করল নেপোলিয়ন।

ফ্রান্সে এসে মাত্র কয়েকটা দিন কাটাল পরিবার-পরিজনের সাথে, তার পরই আবার নির্দেশ এল ডিরেক্টরি সভা থেকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য তৈরি হও। ইংল্যান্ডের বড় প্রতাপ, বড় দম্ভ। সমুদ্রকে সে চষে বেড়াচ্ছে, এমনই তার নৌশক্তি। সবচাইতে বড় কথা, ইংল্যান্ড ফ্রান্সের দিকে বড় বেশি চোখ লাল করে তাকাচ্ছে।

আদেশ মাথা পেতে নিল নেপোলিয়ন। কিছুদিন ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংলিশ চ্যানেলে ইংরেজ নৌবহরের নড়াচড়াও লক্ষ করল। কিন্তু এর পরেই সে ঘোষণা করল, এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড অভিযান নয়। আগে মিশর, তারপর ইংল্যান্ডের কথা ভাবা যাবে। মিশরকে যদি একবার বাগে পাওয়া যায়, তাহলে ইংল্যান্ডও অনেকটা কাহিল হয়ে পড়বে। আইয়োনীন দ্বীপপুঞ্জ যখন হাতের মুঠোয়, তখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে মিশরে যাওয়া তো অত্যন্ত সোজা—।

নেপোলিয়নের এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝে সায় দিল ডিরেক্টরি সভা।

মিশর অভিযানের জন্য প্রস্তুত হল নেপোলিয়ন। মিশর তখন ছিল তুর্কি সুলতানের অধীনে, তবে সে শুধু নামে। বাস্তবে মিশর ছিল মামেলুকদের অধীনে একটা দুর্বল দেশ। এজন্য পরিকল্পনার দিক থেকে আরো একটু এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন। ভেবেই নিল, মিশর জয় করতে পারলে ইংরেজদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ভারতবর্ষও আক্রমণ করা যাবে। আক্রমণ করার দুটো পথও আছে। একটা তুর্কি ও পারস্যের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে জলপথে। আর

অন্যটা? দ্বিতীয় পথটার বেলায় কল্পনাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলল নেপোলিয়ন। সুয়েজ যোজকে যে মজে–যাওয়া পুরোনো খাল আছে, সেটাকে আবার খুঁড়ে একটু ঠিকঠাক করে জাহাজ নিয়ে একেবারে লোহিত সাগরে পড়া। তারপর সেখান থেকে আবার জাহাজ ভাসিয়ে ভারত মহাসাগরে।

এখানে একটা জিনিস ভাবতে বড় অবাক লাগে। নেপোলিয়ন ইংলিশ চ্যানেল আর ইউরোপের সমুদ্রে ইংরেজদের প্রতাপ সম্পর্কে বেশি রকমের সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তার কল্পনার লাগামকে কেন অতখানি ছেড়ে দিয়েছিল! একটা মহাদেশ থেকে আরেকটা মহাদেশে যেতে যে–সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, সে–সমুদ্র আল্পস্ পর্বতমালার চাইতেও ভয়ঙ্কর ও বিক্ষুব্ধ, কেন নেপোলিয়নের মতো একজন অভিজ্ঞ লোক সেটা বুঝল না! আর কেন বুঝল না, সেই সময় ভারতবর্ষের তিন দিকের তিনটা সমুদ্রই শাসন করছে ইংরেজ! যাদের সাথে পেরে উঠছে না ভারতবর্ষে বসবাসকারী ফরাসি ঔপনিবেশিকরা। ফরাসিরা যেসব ভারতীয় রাজন্যবর্গকে সাহায্য করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল, যাদের মধ্যে মহিসুরের টিপু সুলতান ছিল সর্বাগ্রে, তারা কেউ পারছে না ইংরেজদের সাথে।

যাই হোক, তবু সাজানো হল সেনাবাহিনী, নৌবহর। জোসেফাইনকে কাছে ডাকল নেপোলিয়ন। কেমন বিমর্ষ মনে হচ্ছে তাকে। কারণ ছিল, কারণটা মানসিক। জোসেফাইন এখনো কেন মা হচ্ছে না। আবার অন্যদিকে হিপ্পোলাইটের নাম জড়িয়ে কিছু অকথা–কুকথাও এসেছে কানে। জোসেফাইনের দুটো হাত টেনে নিল নেপোলিয়ন। বলল, 'তুমি ওই লোকটার সাথে একদম কথা বলবে না, মেলামেশা করবে না—।'

জোসেফাইনও সাথে সাথে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না না, ওর সাথে আবার কিসের কথা!'

মহা খুশি হল নেপোলিয়ন। ঘনিষ্ঠভাবে কাছে টানল স্ত্রীকে। আর কদিনই বা এমন কাছাকাছি থাকা। মিশর তো হাতছানি দিচ্ছে—

প্রস্তুত হল মিশর অভিযান। সবসুদ্ধ এক শ আশিটা জাহাজ, এক হাজার কামান, প্রচুর গোলাগুলি, সাত শ ঘোড়া আর সতের হাজার সৈন্য। ইতালির উপকূলেও প্রস্তুত রয়েছে আরেকটা নৌবহর। তাতে জাহাজের সংখ্যা চার শ। সৈন্য পঞ্চান্ন হাজার। দুই নৌবহর মিলিয়ে অজস্র গোলাগুলি, রসদপত্র। এই বিরাট, বিশাল অভিযানের নায়ক নেপোলিয়নের বয়স তখন তিরিশও পেরোয় নি।

১৭৯৮ সালের ১৯ মে। শুরু হল যাত্রা। নেপোলিয়ন যে–জাহাজটিতে ছিল, তার নাম লা ওরিয়েন্ট। জুন মাসের মাঝামাঝি গুরুত্বপূর্ণ মাল্টা দ্বীপ জয় করে নিল নেপোলিয়ন। যুদ্ধ করে নয়, টাকা দিয়ে। দ্বীপ রক্ষাকারীরা খুব সহজেই টাকার বশ হয়ে গেল। নেপোলিয়নের অধিকার মেনে নিল। সেখানে কয়েক দিন থেকে দ্বীপটাকে ঢেলে সাজাল নেপোলিয়ন। পুরোনো আদব–কায়দা সব তুলে দিল। দু হাজারের মতো তুর্কি ও ম্যুর সৈন্য বন্দি ছিল সেখানে। তাদেরও মুক্তি দিল। সবচাইতে ভালো কাজ হল, মাল্টা থেকে ঘৃণ্য দাসপ্রথা তুলে দেওয়া।

আবার শুরু হল যাত্রা। উত্তর মিশরে তখন আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়া জাহাজ লাগাবার আর কোনো উপযুক্ত বন্দর ছিল না। তবে আগে তো জায়গাটা দখল করতে হবে, তারপর অন্য কথা—।

কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তেই যুদ্ধের মধ্যে যেতে চাইল না নেপোলিয়ন। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মাইল আষ্টেক দূরে মারাবত নামে সাদা বালি ভর্তি তীরভূমিতে নেপোলিয়ন তার

সেনাবাহিনীকে নেমে যেতে বলল। জাহাজ দূরে নোঙর করা রইল। সৈন্যরা পানি ভেঙে তীরে উঠল।

ওদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার সৈনিকরা ফরাসি সৈন্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল। আলেকজান্দ্রিয়া প্রবেশের সব কটা প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দিল তারা। ভুলে একটা গেট খোলা পড়ে রইল। এই পথেই তার সেনাবাহিনীকে ভেতরে ঢোকাল নেপোলিয়ন। সংঘর্ষ হল বটে, তবে আলেকজান্দ্রিয়া জয় করতে খুব একটা কষ্ট হয় নি তার।

এরপর এগিয়ে যেতে লাগল নেপোলিয়ন। তবে পদে পদে অসুবিধা হতে লাগল। বাধা পড়তে লাগল। অত্যন্ত গরম, আগুনের মতো তপ্ত বালি। ফলে আকণ্ঠ পিপাসায় অস্থির হয়ে উঠল সেনাবাহিনী। তার ওপর আবার ছিল কাঁকড়াবিছে ও কালো মাছির দংশন। সৈন্যদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অবশেষে চোখে পড়ল গিজা শহর। উঁচু উঁচু পিরামিডের বিশাল ছায়ার সাথে মিশে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তুর্কি, মিশরি আর মামেলুক সেনাবাহিনী।

শুরু হল যুদ্ধ। মামেলুক, মিশরি বা তুর্কিরা লোক হিসেবে দুর্ধর্ষ। যখন-তখন সংঘর্ষে অভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধরীতি, কামান-বন্দুকের ব্যবহারে তারা অনেক পিছিয়ে ছিল। সুতরাং হুঙ্কার ছেড়ে তারা ফরাসি বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু এদিকের চমৎকারভাবে সাজিয়ে রাখা কামানগুলো থেকে এমন আগুনে-গোলা ছুটতে লাগল যে এগিয়ে-আসা মিশরি সৈন্যদের অর্ধেক তো মরলই, বাদবাকিরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল। পালাতে গিয়ে বেশ কিছু ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলনদের গভীর পানিতে।

এই পিরামিডের দেশে যুদ্ধ চলেছিল দু ঘণ্টা। তাতেই নেপোলিয়ন শত্রুপক্ষকে কাত করে ফেলল। ফরাসি সৈন্য মারা গেল দু শর মতো। কিন্তু তার বদলে নেপোলিয়ন বন্দি করল প্রায় চব্বিশ হাজার শত্রুসৈন্য, আর জয় করে নিল মিশরের অনেকখানি অংশ। যেসব মামেলুকরা ঘোড়ার চেপে পালিয়ে যাচ্ছিল, তাদের পেছনে ধাওয়া করে সিনাই মরুভূমিতে ধরে ফেলল। তাদের কাছে পাওয়া গেল প্রচুর সোনা আর দুর্মূল্য রত্ন। নেপোলিয়ন এসব ভাগ করে দিল তার সৈন্যদের মধ্যে।

ইতোমধ্যে কায়রো শহর আর তার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা বেশ ভালো করে দেখছিল নেপোলিয়ন। লক্ষ করল কী সব অপূর্ব মসজিদ, কী বিরাট বিরাট প্রাসাদ, মামেলুকদের কী ঐশ্বর্যময়, বিলাসবহুল জীবন! আর সাধারণ লোকেরা? তাদের জীবন? তারা জীবন কাটায় জীর্ণ বস্তিবাড়িতে কোনোরকমে মাথা গুঁজে। খায় কুমড়ো আর মাছি ভ্যানভ্যান করা শুকনো খেজুর। ভাগ্য ভালো হলে কখনো-সখনো উটের দুধে তৈরি পনিরের টুকরো আর রুটি।

এই অবস্থার সমাপ্তি টেনে উন্নতি চাইল নেপোলিয়ন। মামেলুকদের প্রাসাদে অস্থায়ী অফিস পাতল। সেখান থেকে ঘোষণা করল, অতঃপর এখানে আর তুর্কি শাসন নয়। মামেলুকদের খবরদারি নয়। এবার থেকে এদেশের ন জন শেখকে নিয়ে একটা শাসনসমিতি গঠিত হবে। সেই সমিতির উপদেষ্টা থাকবে একজন ফরাসি। এখন থেকে এখানে নতুন শিক্ষা, নতুন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হবে।

আর ঠিক এই সময়েই একটা দুঃসংবাদ শুনে মাথায় হাত দিল নেপোলিয়ন। লা ওরিয়েন্টসহ ফরাসিদের অন্য যে ষোলটা জাহাজ আবুকির উপসাগরে নোঙর করা ছিল, নেলসন নামে কে এক দুঃসাহসী ইংরেজ নৌ-সেনাপতি মাত্র পাঁচটা জাহাজ নিয়ে সেই সতেরটা জাহাজের মধ্যে তেরটাই শেষ করে দিয়েছে। চোখে অন্ধকার দেখল নেপোলিয়ন। যেসব জাহাজে খাদ্য আসবে, সৈন্য আসবে, যার সাহায্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা ঠিক

থাকবে, সেই জাহাজগুলোই নষ্ট করে দিল। কে এই ইংরেজ সেনাপতি হোরাসিও নেলসন ...!

নেপোলিয়নের জীবনেতিহাসে এই নেলসনই হল প্রথম নিয়তি, যে নৌযুদ্ধে সব সময় নেপোলিয়নকে হঠিয়ে দিয়েছে। নইলে নেপোলিয়নকে ঠেকাত কে...!

বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল। যেটুকু জায়গা নেপোলিয়ন অধিকার করেছিল, সেখানে সে এক কর্মযজ্ঞ শুরু করল। শাসনসমিতি তো তৈরি করলই, আরো করল কায়রো আর আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা। একটা টাঁকশাল বসিয়ে সেখানে মামেলুকদের সোনা গলিয়ে ফরাসি মুদ্রা চালু হতে লাগল। প্রধান রাস্তায় ত্রিশ ফুট অন্তর অন্তর আলো বসানো হল। তিন শ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল হল। একই সময়ে স্থাপিত হল চারটে ছোঁয়াচে রোগ নিরাময় কেন্দ্র। এসব জনকল্যাণমুখী কাজ করে মিশরের জাতীয় জীবনের সাথে নেপোলিয়ন নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে দিল যে মিশরীয়রা তাকে আদর করে 'সুলতান এল কবির' বা মিশরের সর্বময় শাসক বলে ডাকতে শুরু করল।

কেটে গেল আরো কয়েকটা কর্মব্যস্ত মাস। নেপোলিয়নের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে না তার মনে চিন্তাভাবনা আছে। কিন্তু আবার এল এক দুঃসংবাদ। এ সংবাদ অসহনীয়। ফ্রান্স থেকে একটা চিঠি এসে পৌঁছল মিশরে। চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল নেপোলিয়ন। জোসেফাইন নাকি হিপ্পোলাইটের সাথে বড় বেশি মাখামাখি শুরু করেছে। মেলামেশাটা বেশ প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ। গোটা প্যারিসে ব্যাপারটা নিয়ে জোর কানাকানি। লন্ডনের সংবাদপত্র 'মর্নিং ক্রনিকল'–এ নানা চুটকি ও রসালো মন্তব্য করা হল। নেপোলিয়নের যুদ্ধ–গৌরবকে ছাপিয়ে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এক ধরনের আনন্দ উপভোগ করতে লাগল সবাই।

নেপোলিয়নও অসাধারণ মনের জোরে এত বড় দুঃখ চেপে গিয়ে এক মজার খেলা দেখাল সবাইকে। তারই সেনাবাহিনীর মধ্যে এক লেফটেন্যান্টের স্ত্রী ছিল পলিন কোর্স। স্বামী--স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো ছিল না। নেপোলিয়ন হঠাৎ এই মেয়েটার প্রতি আগ্রহ দেখায়। পলিন তো আনন্দে আত্মহারা। স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেপোলিয়নের ঘনিষ্ঠ হল সে। কায়রোর রাজপথে প্রকাশ্যভাবে নেপোলিয়ন তার গাড়িতে পলিনকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। লোকে দেখুক, জানুক, জোসেফাইন না থাকলেও নেপোলিয়নের কিছু যায়–আসে না। জোসেফাইন নেই তো বয়ে গেছে। সবাই তাকিয়ে দেখুক আর জোসেফাইনের কানে খবরটা পৌঁছে দিক। কিছুদিন পরে প্যারিসের পথেঘাটে খবর রটল মিশরে গিয়ে বিজয়ী বীর নেপোলিয়ন কেমন একজন ক্লিওপেট্রা খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি নেপোলিয়ন জোসেফাইনকে ভুলতে পেরেছিল? বাইরে যতই সে পলিনকে নিয়ে মাতামাতি করুক, এবং যতই 'কিছুই হয় নি' ভাব দেখাক, মনের গভীরে কিন্তু গুমরে গুমরে কেঁদে উঠেছিল একটাই নাম—জোসেফাইন।

এরপর একের পর এক আসতে শুরু করল দুঃসংবাদ। এ দুঃসংবাদ মনের নয়। বড় কঠিন, বড় বাস্তব!

ইংরেজদের প্ররোচনায় হঠাৎ তুর্কিরা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল ফরাসিদের বিরুদ্ধে। শুধু ঘোষণা নয়, কিছুদিনের মধ্যে মিশর আক্রমণ করার জন্য সিরিয়াতে এক বিরাট তুর্কি বাহিনী জমায়েত হল।

নেপোলিয়নও তৈরি হল। তের হাজার পদাতিক সৈন্য, নয় শ অশ্বারোহী আর ঊনপঞ্চাশটা কামান নিয়ে এগিয়ে গেল সিরিয়ার দিকে। পথে পড়ল দুঃসহ সিনাই মরুভূমি।

তারপর গাজা শহর—যেটা সহজেই জয় করে নিল নেপোলিয়ন। সেইসাথে বন্দি হল হাজার দুয়েকের মতো তুর্কি সৈন্য।

এরপর জাফা জয় করল নেপোলিয়ন। এখানে বন্দি হল হাজার চারেক। বন্দি তো হল, কিন্তু খাওয়াবে কী? খাবার যা আছে তাতে নিজের সেনাবাহিনীরই অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে চলবে। তবে? শত্রুবন্দিদের তো মুক্তি দেওয়া যায় না। তাতে ফরাসি সৈন্যদেরই মৃত্যুবাণ তৈরি করা হবে। সুতরাং এদের উপোসী রাখতে হবে, নইলে...

শিউরে উঠল নেপোলিয়ন। বিবেকের দিক থেকে মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তো মেনে চলতে হবে। সমর-পরিষদে ব্যাপারটা তুলতেই সবাই একবাক্যে মত দিল। বন্দিদের গুলি করে মারা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। খাবার অত্যন্ত সীমিত। ফরাসি সেনাদেরই রেশন করে খেতে হচ্ছে। অতএব একমাত্র বন্দুকের গুলিই পারে এই সমস্যার সমাধান দিতে। তাই-ই হল। রাজনীতি, সমরনীতিতে তো ভাবপ্রবণতার কোনো স্থান নেই—।

আবার ছুটল নেপোলিয়ন। থামল গিয়ে একার নামে একটা জায়গায়—যার তিন দিকে সমুদ্র আর এক দিকে দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেখানে কামান তাক করে বসে রয়েছে তুর্কি সৈন্যরা। আর তাদের সাথে রয়েছে আট শ ইংরেজ নৌ-সেনা। তাদের কমান্ডার সিডনি স্মিথ। নেপোলিয়ন এখানে সুবিধা করে উঠতে পারল না। সমুদ্রপথে বেশিরভাগ কামান পাঠিয়েছিল সে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলো এখন সমুদ্রের রাজা ইংরেজদের হাতে। সুতরাং যে কটা কামান বাকি ছিল তা দিয়ে আঘাত করা যায়, জয় করা যায় না। পিছু সরতে লাগল ফরাসি সৈন্যরা। আরেক পাশে, মাউন্ট থাবোরের কাছে আরেকটা খণ্ডযুদ্ধ চলছিল একই সময়। সেখানে মাত্র সাড়ে চার হাজার ফরাসি সৈন্য পঁয়ত্রিশ হাজার তুর্কি সৈন্যকে পরাজিত করল। করবেই, কারণ এখানে যে শুধু তুর্কিরা। একার দুর্গের যুদ্ধটা আসলে হয়েছিল ইংরেজদের সাথে।

কিন্তু আখেরে কিছুই ভালো হল না। নিদারুণ গরম, শত্রুপক্ষের তীব্র আক্রমণ আর সেইসাথে মহামারী প্লেগের আবির্ভাবে সব পণ্ড হয়ে গেল। কয়েকজন বিশ্বস্ত দক্ষ সেনাপতি মারা গেল। নেপোলিয়ন নিজেও কয়েকবার দৈব্যবলে বেঁচে গেল। চারদিকে শুধু হাহাকার আর আসন্ন পরাজয়ের বেদনা।

ষোলকলা পূর্ণ হল, যখন দেখা গেল আরো তিরিশটা জাহাজ ইঙ্গ-তুর্কি সৈন্য ও রসদপত্র নিয়ে এগিয়ে আসছে। শেষ লড়াইয়ের চেষ্টা করল নেপোলিয়ন। কিন্তু পারল না। ছ সপ্তাহ ধরে যে একার দুর্গটা অবরোধ করে রেখেছিল; যে দুর্গটা জয় করতে পারলে দামাস্কাস, কনস্টান্টিনোপল জয় করবার পথ খুলে যেত, ইংরেজ-শক্তিকে বেশ খানিকটা নাড়া দেওয়া সম্ভব হত, সেই অবরোধ এবার তুলে নিতে বাধ্য হল নেপোলিয়ন। এই প্রথম পিছু হঠা। বড় বেদনাময়, বড় দুঃখের! ইংরেজদের উদ্দেশে সেদিন মনে মনে কী বলেছিল নেপোলিয়ন, জানা যায় নি। তবে ঘটনা যে আরো অনেক দূর গড়াবে, কালের ব্ল্যাকবোর্ডে তার স্বাক্ষর পড়ল। এবার মিশরের দিকে ফিরে আসতে লাগল নেপোলিয়ন।

দুর্গম পথের শেষ হল একদিন। অবশেষে জুন মাসের গোড়ার দিকে শেষ হল যাত্রাপথ। তবে বেশিদিন বিশ্রাম নিতে পারল না নেপোলিয়ন। এগারই জুলাই জলপথে আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে, আবুকির উপদ্বীপে ছাউনি ফেলল তুর্কি সৈন্যরা। তার কয়েক দিন পর পঁচিশে জুলাই তুর্কি বাহিনীকে আক্রমণ করল নেপোলিয়ন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল,

সেনাপতি মুরাট কী কৌশলে, কী বীরত্বের সঙ্গেই না যুদ্ধ করছে! সাধ্য কি তার সামনে তুর্কিরা দাঁড়ায়। অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মরণপণ করে তুর্কিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরাট। পালাতে লাগল তুর্কিরা। কিন্তু পালাবে কোথায়! পেছনে সমুদ্র। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের গ্রাস করবার জন্য। ঠিক তাই হল। মুরাটের তাড়া খেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার তুর্কি সৈন্য ডুবে মারা গেল। দু হাজার শেষ হল যুদ্ধক্ষেত্রে । বন্দি হল আরো দু হাজার।

মুরাটকে জড়িয়ে ধরল নেপোলিয়ন, 'শাবাশ বন্ধু! এত দিনে এবারের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছ। শাবাশ—!'

দেখতে দেখতে তেরটা মাস কেটে গেল নেপোলিয়ন মিশরে এসেছে। মিশরকে নতুনভাবে সংগঠিত করেছে। দেখাই যাক না, আরো কিছুদিন এখানে থেকে নতুন কিছু করা যায় কি না। প্যারিস তো আর কাছে টানছে না। জোসেফাইনকে মনে করেও তো আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয়ে যায় অন্য রকম। তাই নেপোলিয়ন যখন আরো কিছুদিন মিশরে থেকে যাবার পরিকল্পনা করেছে, ঠিক তখনই খানকয়েক খবরের কাগজ এল ইউরোপ থেকে। আজ প্রায় ছ মাস হল ফ্রান্সের খবর নেই। দেখাই যাক, এর মধ্যে নতুন কী ঘটল ওখানে

খবরের কাগজে চোখ বুলিয়েই মাথায় হাত দিল নেপোলিয়ন। এ কী সর্বনাশ আজ ফ্রান্সের! ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়িয়েছে ইংল্যান্ড, তুর্কি, নেপল্‌স, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া। ইঙ্গ–রুশ সৈন্য হল্যান্ডে উপস্থিত। অস্ট্রো–রুশ সেনাবাহিনী সুইজারল্যান্ড আক্রমণ করে জুরিখ নিয়ে নিয়েছে। তুর্কি–রুশ নৌবহর আইয়োনীন দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে কর্ফু জয় করেছে ...

এ কী সর্বনাশ! এ কী অর্থনৈতিক দুর্দশা আজ ফ্রান্সের! গোটা অর্থনীতি আজ ধ্বংসের মুখে। তাকে না সামলালে বিপ্লবী ফ্রান্সের এ ক বছরের ইতিহাস যে একেবারেই শেষ হয়ে যাবে! খবরে লিখেছে, ফরাসি সিংহাসনে এবার নাকি বসবেন সেই বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই। সব সব অর্থহীন। ১৭৮৯ থেকে এ পর্যন্ত ফ্রান্সের এগিয়ে যাবার যে–ইতিহাস, সব নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে ...

কয়েকটা মুহূর্ত ভাবল নেপোলিয়ন। তারপর লাফিয়ে উঠে নৌ–অধ্যক্ষ গ্যানটিউনকে ডেকে পাঠাল। খবর নিয়ে জানল, মাত্র চারটা জাহাজ তৈরি হতে পারে এখনই।

'ঠিক আছে, যাত্রার জন্য তৈরি হন। ওই চারটা জাহাজ নিয়েই ফ্রান্সের দিকে রওনা দেব। দেশের যে বড় বিপদ ...।'

প্রায় চোদ্দ মাস মিশরে কাটিয়ে, ১৭৯৯ সালের ২৩ আগস্ট ফ্রান্সের দিকে পাড়ি জমাল নেপোলিয়ন।

প্যারিসে এসে পৌঁছল ১৬ অক্টোবর। জোসেফাইনকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। এল দু দিন পর। এই দু দিন মনে মনে বেশ কয়েকবার শপথ নিয়েছে নেপোলিয়ন, 'জোসেফাইন, এবার আর কিছুতেই ক্ষমা নয়, এবার চিরকালের মতো বিচ্ছেদ ...।'

কিন্তু দু দিন পর, জোসেফাইন যখন বাড়ি ফিরে ইনিয়ে–বিনিয়ে বলল, 'আমি তো বার্গান্ডির পথে এগিয়ে গিয়েছিলাম তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। এজন্যই দু দিন দেরি

হল। আমি কি জানতাম তুমি অন্য পথে আসবে?'

জোসেফাইনও জানত, একটু চোখের পানি আর তার সাথে কান্নাভেজানো অনুরাগে ভরা দু-একটা কথা, তাহলেই গলে যাবে নেপোলিয়নের মন।

ঠিক তা-ই হল। সব ভুলে স্ত্রীকে বুকে জাপটে ধরল নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়নকে অভ্যর্থনা জানাল ডিরেক্টররা। তারা বলল, নেপোলিয়ন ইচ্ছেমতো যে কোনো সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষ হতে পারে। নেপোলিয়নের মন কিন্তু সৈন্য পরিচালনার দিকে ছিল না। তার দৃষ্টি পড়েছিল ঠিক সেই জায়গায়, যেখানটায় ঘুণ ঘরেছিল। ঘুণ ধরেছিল ডিরেক্টরদের মধ্যে, যাদের ওপর কিনা গোটা ফ্রান্সের বর্তমান, ভবিষ্যৎ—দুই-ই নির্ভর করছিল। অন্যতম ডিরেক্টর পল বারাস এই বিশৃঙ্খলার সময়ও নিজের স্বভাবমতো কাজ করে বেড়াচ্ছিল। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তার পেছনে ঘুরঘুর শুরু করে দিত। আরেকজন ডিরেক্টর, তেপ্পান্ন বছরের লুই গোহের তারও সেই অবস্থা। অর্থাৎ মেয়ে দেখলেই মাথা খারাপ।

দেশের শাসকদের মধ্যেই যখন এই শিথিলতা, তখন দেশের ও দশের শাসনে শৈথিল্য তো আসবেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিপ্লবের ফল ব্যর্থ হয়ে যায় এই পরবর্তী অধ্যায়ে।

গোটা পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করে, সবকিছু ভেবেচিন্তে দেখল নেপোলিয়ন। এই সঙ্কটে তাকে শুধু যুদ্ধ নয়, শাসনকার্য পরিচালনায়ও দক্ষতা দেখাতে হবে। নইলে পিছিয়ে যাবে ফ্রান্স । পিছিয়ে যাবে ১৭৮৯-এর আগের রাজত্বে। তার মানে আবার অভাব, আবার অবিচার, অত্যাচার; আর সেই ফাঁকে ফ্রান্সের সিংহাসনে এসে বসবে বুরবোঁ রাজা অষ্টাদশ লুই।

নিজেকে অন্যতম ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত করতে চাইল নেপোলিয়ন। নইলে শাসননীতি পরিচালনায় কোনো অধিকারই পাবে না। এই ইচ্ছেটা প্রথম পল বারাসের কাছে প্রকাশ করল সে। নেপোলিয়নের ডিরেক্টর হবার বাসনায় খুশি হওয়া তো দূরের কথা, শুনে আঁতকে উঠল পল বারাস। সে নিজেই তখন ঘুসের বিনিময়ে বুরবোঁ রাজবংশকে আবার ফিরিয়ে আনার নষ্টামিতে লিপ্ত ছিল। সুতরাং নেপোলিয়নকে লুই গোহেরের সাথে দেখা করার পরামর্শ দিল সে। লুই গোহের তো শুনে চোখ কপালে তুলল। কী সর্বনাশ! যুদ্ধ করছিল, বেশ করছিল। নেপোলিয়ন আবার শাসনদণ্ড হাতে নিতে চাইছে কেন? ওর মতো লোক একবার এ লাইনে মজা পেয়ে গেলে তাদের আর কিছু করে খেতে হবে না। পাততাড়ি গোটাতে হবে।

লুই গোহের মনের ভাব প্রকাশ না করে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি দেশের ভালো করবার কাজে এগিয়ে আসতে চাইছ, খুবই ভালো কথা। তবে বাপু একটা বাধা আছে।'

'বাধা আছে!' বিস্মিত হল নেপোলিয়ন।

'হ্যাঁ, তোমার বয়স এখন সবে তিরিশ, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কী...?'

'ওই তিরিশ বছরই তো তোমাকে মেরেছে। আইন অনুযায়ী তুমি তো চল্লিশের আগে ডিরেক্টরের নির্বাচনেই নামতে পারবে না।'

বুঝতে পারল নেপোলিয়ন, এই নির্লজ্জ তথাকথিত শাসকেরা তার পুরোপুরি বিরোধী। অথচ ওদিকে দেশে ভরাডুবি হতে চলেছে। দ্রুত ভাবতে লাগল সে, কী করা যায়। এমন একটা কাণ্ড ঘটাতে হবে, যাতে দেশের শাসনদণ্ড হাতের মুঠোয় পুরে ফেলা যায়। কিন্তু কী করা যায়? টাকা-পয়সার জোরও নেই, আবার সশস্ত্রবাহিনী কেবলমাত্র তার কথায় কিছু একটা করে সব উল্টে দেবে, এমনও আশা করা যায় না। তবে ...।

চুপ করে বসে থাকা যায় না। একটা পরিবর্তন আনার জন্য অস্থির হয়ে উঠল নেপোলিয়ন। এই ব্যাপারে একজনকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল। নাম জোসেফ সিয়ে। অন্যতম ডিরেক্টর। বয়সে প্রৌঢ়। ডিরেক্টরি সভার অধীনে যে কাউন্সিল অব ফাইভ হান্ড্রেড বা পাঁচ শ সদস্যের সমিতি ছিল, তার মধ্যে জোসেফ সিয়ে ছিল সবচাইতে প্রভাবশালী। দুজনে মিলে সলাপরামর্শ করল। বুঝতে পারল, যত দিন না ওই ডিরেক্টরি সভার অদলবদল হবে, তত দিন দেশে শান্তি আসবে না। কথাটা দুজনের মধ্যে হলেও ফাঁস হয়ে গেল। ডিরেক্টররা সতর্ক হল। তারা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল যাতে চোখ রাঙিয়ে দেশবাসীকে শক্ত হাতের মুঠোয় রাখতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে পাঁচ শ সদস্যের সমিতির কয়েকজন, যেমন ট্যালির‍্যান্ড, রোয়েডারার, নেপোলিয়নের দুই ভাই জোসেফ ও লুসিয়েন প্রমুখ নেপোলিয়নের সাথে হাত মেলাল। তারাও এই ডিরেক্টরি সভার পতন চাইল। লুই গোহেরের কানে সব খবরই পৌঁছল। নেপোলিয়নকে একটা সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ করে দূরে সরিয়ে দিতে চাইল সে। কিন্তু যেতে অস্বীকার করল নেপোলিয়ন।

ডিরেক্টরি সভার অধীনে পাঁচ শ সদস্যের সভা ছাড়াও আরেকটা ছিল কাউন্সিল অব এলডার্স বা প্রাচীনের সভা। এর সদস্য সংখ্যা ছিল দু শ পঞ্চাশ। নেপোলিয়ন যে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ চাইছে, সেই ব্যাপারে এই দুটো কাউন্সিলের পূর্ণ সমর্থন আবশ্যক। কাজে নেমে পড়ল সে।

ওদিকে পাঁচ শ সদস্যের সভায় একটা জরুরি মিটিঙে নেপোলিয়নের সমর্থক এবং অন্যতম ডিরেক্টর করনেট ঘোষণা করল, 'বর্তমান শাসনে বিপদ ঘটতে যাচ্ছে। এ বিপদ যদি আমরা রুখতে না পারি, তাহলে রিপাবলিক ফ্রান্সের মৃত্যু অনিবার্য।' করনেটের প্রস্তাবে ঠিক হল, পরদিনই সেন্ট ক্লাউড বলে একটা জায়গায় মিলিত হবে সবাই। এবং নেপোলিয়নকে প্যারিসের সর্বময় সেনাধ্যক্ষ করে দেয়া হবে। নইলে কিছুই রক্ষা পাবে না।

ওই দিনই কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে ট্যুইলারি প্রাসাদের দিকে ছুটে গেল নেপোলিয়ন। তিন শ সদস্যের একটা বাহিনীকে পাঠাল লুক্সেমবার্গে—যেখানে লুই গোহের, পল বারাস, ডুকো প্রমুখ নেপোলিয়নবিরোধী ডিরেক্টররা ছিল। ভয় পেয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হল তারা।

পরদিন ভোরে সেন্ট ক্লাউডে ছুটে গেল নেপোলিয়ন। এখানে কাউন্সিল অব এলডার্সের অধিবেশন বসবে। এই সভার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেলে তবেই ডিরেক্টরি সভার পতন ঘটবে।

অধিবেশন বসতে একটু দেরি হয়ে গেল। বেলা সাড়ে তিনটায় সভার সভাপতি অধিবেশন উদ্বোধন করে প্রথমেই ঘোষণা করল, পাঁচ জনের মধ্যে চার জন ডিরেক্টরই পদত্যাগ করেছে। এখন এই সভার প্রধান কাজ হবে নতুন ডিরেক্টর নির্বাচন করা। ঠিক আছে, তাই হবে। এদিকে নেপোলিয়ন সামরিক অধিনায়ক হিসেবে কাউন্সিল অব এলডার্সের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য স্বীকার করল। সব সদস্যের সমর্থন পাবার পর সেদিনের মতো সভা মুলতুবি ঘোষণা করা হল।

পরদিন। সভাগৃহে সদস্য–গ্যালারি ক্রমশ ভরে উঠল। দৃপ্ত পদক্ষেপে ভেতরে ঢুকল নেপোলিয়ন। চারপাশে একবার তাকিয়েই বুঝতে পারল বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে শাসন কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া একটু শক্তই হবে।

উঠেই শুরু করল নেপোলিয়ন, 'দেশ এখন একটা আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। দেশের একজন সৈনিক হিসেবে আমি খোলা মন নিয়ে বলছি, আসুন, আমরা সবাই মিলে আমাদের এত সাধনার সাম্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করি...। আপনাদের ভয় নেই, বন্ধুরা, আমি আপনাদের সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচাব। আমার সৈনিকদের হাতে অস্ত্র আছে। একদিন এদের সাহায্যেই রিপাবলিক ফ্রান্সের সৃষ্টি করেছিলাম। কেউ যদি বিদেশীর অর্থপুষ্ট হয়ে আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা করে, তাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমারও সশস্ত্র অনুচর আছে। আমি তাদের আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যারা আমার বিরোধিতা করবে, তরবারির আঘাতে তারা শেষ হয়ে যাবে। তারা যেন মনে রাখে, রণদেবতা ও ভাগ্যদেবতা, এই দু জনেরই আশীর্বাদ রয়েছে আমার ওপর।' এ কী কথা নেপোলিয়নের মুখে, যে নিজেকে বিপ্লবের সন্তান বলে জাহির করে—সে কিনা বলছে দুজন দেবতার আশীর্বাদ রয়েছে আমার ওপর! একজন ভাগ্যের, অন্যজন যুদ্ধের। অর্থাৎ যা চাইছি ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও, নইলে গুলি ছুড়ব, বেয়নেটে গাঁথব ...।

নেপোলিয়নের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল, সে যেন কোনো যুদ্ধাভিযানে যাবার আগে সৈনিকদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছে। সে বক্তৃতা দম্ভে ভরা। মানুষ যখন অসহায় বোধ করে, তখনই তো সে মুখে আস্ফালন করে আর বলে, আমার এই আছে, সেই আছে। আমার কথা মেনে চল... নইলে কপালে দুঃখ আছে ... ইত্যাদি।

গুঞ্জন শোনা গেল কাউন্সিল অব এলডার্সের সদস্যদের মধ্যে। এ কী অগোছালো কথাবার্তা নেপোলিয়নের! এই লোকটার ওপর দেশের ভাগ্য ছেড়ে দিলে সে তো একদিনে সব তছনছ করে ফেলবে!

নেপোলিয়নের কানের কাছে এসে একজন বলল, 'সেনাপতি, কী সব আজেবাজে বকছেন বুঝতে পারছেন না। আপনি এখন চলে যান এখান থেকে ...।'

গোটা পরিস্থিতি যে গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে সেটা নেপোলিয়নও বুঝতে পারছিল। কিন্তু বুঝলে কী হবে। সে যে বাকসংযম হারিয়ে ফেলেছে। তাই ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় আবার বলে উঠল, 'দেশের এই নাজুক অবস্থা মোকাবিলা করবার জন্য যত শিগ্‌গির সম্ভব একটা কমিটি করে ফেলুন।' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

কাউন্সিল অব এলডার্সের সভায় বাজিমাত করতে পারল না নেপোলিয়ন। এবার চেষ্টা করল যাতে কাউন্সিল অব ফাইভ হান্ড্রেডের সমর্থন পাওনা যায়। বিশেষ করে ভাই লুসিয়েন যখন সেই সমিতির সভাপতি, তখন একটু ভরসা আছে বইকি।

কিন্তু সেখানেও যে ইতোমধ্যে সব সদস্যরা জেকোবিন পার্টির চালু শাসননীতির ওপর পূর্ণ আস্থা জানিয়ে নেপোলিয়নের অবস্থা সঙ্গীন করে তুলেছে, সেটা সে আগে বুঝতে পারে নি। সভাগৃহে ঢুকে লক্ষ করল নেপোলিয়ন, সদস্যরা মুখ ভার করে বসে রয়েছে। একজন এসে তার হাত ধরে বলল, 'কোন সাহসে আপনি এখানে ঢুকেছেন? শিগ্‌গির বেরিয়ে যান। আপনি পবিত্র আইন লঙ্ঘন করেছেন।'

হঠাৎ গর্জন শোনা গেল চারপাশ থেকে, 'বের করে দাও ওই স্বেচ্ছাচারীটাকে...।'

লুসিয়েন তার আসন থেকে কী যেন বলার চেষ্টা করল। কিন্তু গোলমাল শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। নার্ভাস হয়ে পড়ল নেপোলিয়ন। মুখ শুকিয়ে পাংশু । তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল সে। পারল না। সদস্যরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তাকে। ভাগ্য ভালো যে নেপোলিয়নের অনুগত কিছু সৈনিক এই বিপজ্জনক বেষ্টনী থেকে উদ্ধার করে বের

করে দিল তাকে। তবুও একেবারে অক্ষত রইল না। আসবার সময় কে যেন নখ দিয়ে চিরে দিল মুখটা। রক্ত ছুটল।

ওদিকে লুসিয়েন তখনো সদস্যদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, 'নেপোলিয়ন এখানে ঢুকেছিল তার প্রতি সদস্যদের সমর্থন আছে কি না জানবার জন্য। এর মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার তো কিছু ছিল না...।'

'ছিল বই কী।' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সদস্যরা। 'নেপোলিয়নের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, সবই তো রাজার মতো। নেপোলিয়ন একনায়কত্ব স্থাপন করতে চাইছে। তা চলবে না। চোর তাড়িয়ে ডাকাতের পত্তন হতে দেব না...।'

সভাপতি হিসেবে সদস্যদের বোঝাবার চেষ্টা করল লুসিয়েন। কিন্তু ব্যর্থ হল সব। শেষে খবর পাঠাল নেপোলিয়নের কাছে, 'তৈরি হও।'

তৈরি হল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। অর্থাৎ সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এল। সৈনিকদের সম্বোধন করে বলল, 'আমার প্রিয় সৈনিকগণ, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে আমি তোমাদের নিয়ে তুলোঁ, ইতালি, মিশর ও সমুদ্রবক্ষে জয়ের পথে এগিয়ে গেছি, আর এখন কিনা একদল খুনির কাছে পরাজয় স্বীকার করবে? বল, আমার বীর সৈনিকেরা, আমি কি এই ব্যাপারে, তোমাদের কাছে কিছু আশা করতে পারি না? বল... বল তোমরা।' আবেগে, উত্তেজনায় মুখে রক্ত ফুটল নেপোলিয়নের। তবে কাজ হল। একযোগে বলে উঠল সশস্ত্র সৈনিকরা 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট দীর্ঘজীবী হোন।'

নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যে অভিনয় করল লুসিয়েন নিজে। শাঁ করে খাপ থেকে তরবারিখানা খুলে ফেলল সে। যে-কোনো নিখুঁত কৃতী নায়কের মতোই তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দিয়ে স্পর্শ করল নেপোলিয়নের বুক। তারপর চিৎকার করে বলল, 'আমি শপথ করে বলছি, আমার ভাই যদি কোনো ফরাসি দেশবাসীর অধিকার এতটুকু ক্ষুণ্ন করে, তাহলে এই তরবারি তার বক্ষদেশ ভেদ করে চলে যাবে...।'

চঞ্চল হয়ে উঠল সৈন্যবাহিনী। তাদের প্রিয় সেনাপতিকে তারা কোনো কাজে হঠে যেতে দেবে না। মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়াল পাঁচ শ সদ্যস্যের সভার বিরুদ্ধে।

নেপোলিয়নের পেছনে সশস্ত্র সেনাবাহিনী দেখে মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল সভাগৃহ। যারা উপস্থিত ছিল সবাই ছিটকে পালাল। কেউ দরজা দিয়ে, কেউ-বা জানালা গলে।

পুরোপুরি সফল হল নেপোলিয়ন। পতন ঘটল ডিরেক্টরি সভার। ফ্রান্সের শাসন ইতিহাসে দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটাল সমর-নায়ক নেপোলিয়ন। এই বিপ্লবের বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষ হল না, রক্তপাত হল না। ১৭৯৯ সালের নভেম্বর মাসের ৯ ও ১০ তারিখ। এই দুদিনের ঘটনায় এক নতুন পথ ধরে চলতে শুরু করল ফ্রান্সের ইতিহাস।

জোসেফ সিয়ের সাহায্যে ফ্রান্সের শাসননীতি পুনর্গঠন করল নেপোলিয়ন। তিন জন কন্সাল বা শাসনকর্তাকে নিয়ে গঠিত হল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা কর্মপরিষদ। এর প্রথম কন্সাল হল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষিত হল ১৭৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর। গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার দৃঢ় পরিচয় পাওয়া গেল নতুন শাসনরীতিতে। প্রথম কন্সাল নেপোলিয়নের ইউনিফর্ম হল লাল ভেলভেটের ওপর সোনালি কাজ-করা ডবল ব্রেস্টের পোশাক। জন্য দুজন কন্সালেরও ওই একই ইউনিফর্ম, তবে রং আলাদা। নীল ভেলভেটের ওপর সোনালি কাজ।

শেষ হল রিপাবলিক যুগ। নেপোলিয়নের সামনে এবার টানা সাফল্যের সিঁড়ি। বয়স তখন তিরিশ ছাড়িয়ে মাত্র কয়েক মাস।

প্রথম কন্সাল নেপোলিয়ন যখন নানারকম সংস্কার, শাসননীতি, অনেক নিয়মকানুন, অনেক শৃঙ্খলা দিয়ে ফ্রান্সকে ক্রমে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিচ্ছে, দু হাতে ফরাসি অধিবাসীদের শুভেচ্ছা-প্রীতি কুড়োচ্ছে, সেই সময় অন্য রাজ্যের সাথে যুদ্ধের কিন্তু কমতি ছিল না। এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে শাসনদণ্ড—এই ছিল প্রথম কন্সাল নেপোলিয়নের ব্যস্ততাময় জীবন।

এই সময় তার সবচাইতে বড় সমস্যা দেখা দিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, পোর্তুগাল ও নেপল্‌স-এর জোটবদ্ধ শক্তি নিয়ে। নেপোলিয়নকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য উঠেপড়ে লাগল এরা। তখন হল্যান্ড ছিল ফ্রান্সের অধীনে একটা রিপাবলিক দেশ। সেখানে আচমকা আক্রমণ চালাল ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার সেনাবাহিনী। আবার অন্যদিক থেকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া এগিয়ে এল ইতালির দিকে। সেখানকার সংঘর্ষে জয়লাভ করে মান্টুয়া ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নিল তারা। একদল ফরাসি সেনা আবার পরাজিত হল রুশ সেনাপতি সুভারোকের হাতে। ইতোমধ্যে অস্ট্রিয়া ও ইংল্যান্ডের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠাল নেপোলিয়ন। কিন্তু সাথে সাথে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল তারা। কেন করল সে-কথা এখন থাক। পরে আসবে ...। এখন নেপোলিয়নকে আবার তৈরি হতে হবে ইতালি অভিযানে।

১৮০০ সালে এই ইতালি অভিযান নেপোলিয়নের যোদ্ধা-জীবনে রীতিমতো একটা নাটকীয় অধ্যায়। অস্ট্রীয় সেনাবাহিনী ইতালির প্রত্যেকটা প্রবেশপথ আটকে ফেলল। তাদের সেনাপতি মেলাস অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফরাসি বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হল। এই অবস্থায় বড় এক কঠিন সংকল্প করল নেপোলিয়ন। ইতালির মধ্যে প্রবেশ করতেই হবে, যতই সেনাপতি পথ বন্ধ করে রাখুক। আল্পস্ পর্বত ডিঙিয়ে ইতালি যাবার ব্যবস্থা করল সে। কী সাংঘাতিক, অসম্ভব পরিকল্পনা! 'কেন অসম্ভব? আমরা কি কার্থেজের সেনাপতি হ্যানিবলের কাহিনী পড়ি নি? তিনি যদি একদিন আল্পস্‌কে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত বলে গ্রাহ্য না করে ওই উচ্চতাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে নুইয়ে ফেলে ইতালি অভিযানে যেতে পারেন, তবে আমাদেরই-বা বাধা কোথায়? সব তৈরি হও...।' সেনাবাহিনী, প্রচুর অস্ত্র, কামানবাহী গাড়ি, ঘোড়া, খাদ্য, চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে আল্পস্ পর্বত পার হতে লাগল নেপোলিয়ন। এবং পারও হল। ইতালি প্রবেশ করে ওই বছরই মারেংগোর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করল। শুধু এটুকুই নয়, ফ্রান্স ইতোমধ্যে ইতালিতে যেসব জায়গা হারিয়েছিল, সেগুলোও পুনরুদ্ধার হল। নেপোলিয়ন কতটা অসম্ভব সম্ভব করতে পারে, লোকে যখন এইসব ভাবছে, তখনই এল আরেকটা চমকপ্রদ খবর। ফরাসি সেনাপতি মরো জয়লাভ করেছে হোহেনলিসভেনের যুদ্ধে। ভিয়েনায় ঢুকে গেছে সে। তাড়াতাড়ি করে লুনেভাইল বলে একটা জায়গায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল অস্ট্রিয়া। রাইন নদীর বাম তীরের অঞ্চল ও বেলজিয়ামের ওপর স্বীকৃত হল ফরাসি আধিপত্য, আর সেই একই অধিকার স্বীকৃত হল বাটাভিয়, হেলাভসিয় এবং আলপাইন অঞ্চলে। নেপোলিয়ন আল্পস্ পর্বত তো জয় করলই, আরো জয় করল স্পেনের বিস্তীর্ণ এলাকা।

ফ্রান্সের তদানীন্তন বৈদেশিক শত্রুদের মধ্যে সবচাইতে সোচ্চার ছিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের রাজা তখন তৃতীয় জর্জ। বয়স ষাটের ওপর। দীর্ঘদেহী, গোল মুখ, নীল চোখ—

মাঝেমধ্যেই পাগলামিতে ভুগতেন। নিজের রাজকীয় পদমর্যাদা সম্পর্কে তৃতীয় জর্জ অতিরিক্তভাবে সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিল উইলিয়ম পিট। বাইরে লাজুক লাজুক ভাব, আসলে দৃঢ়মনা, সুকৌশলী, অত্যন্ত কর্মক্ষম। রাজা, মন্ত্রী—এই দুজন তো বটেই, গোটা ইংল্যান্ডই তখন অন্তর থেকে অপছন্দ করেছিল ফরাসি বিপ্লব। এর ওপর আবার নেপোলিয়নের অভ্যুদয়। গোদের ওপর বিষফোঁড়া। এই লোকটার অভ্যুদয় তো শুধু অপছন্দের নয়, ভয়েরও বটে। এই ভয় আরো বেড়ে গেল যখন নেপোলিয়ন একের পর এক রাজ্য জয় করতে লাগল। বিশেষ করে যখন অস্ট্রিয়া অতিক্রম করে বেলজিয়ামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন। এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে উত্তর আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশগুলো ইংল্যান্ডের হাতছাড়া হয়ে গেল। তার ওপর আবার নেপোলিয়নের যা মতিগতি, তাতে তো মনে হচ্ছে বাণিজ্যের ঘুঘু ইংরেজ জাতিকে ইউরোপে আর শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে না। নেপোলিয়ন নামে লোকটাকে যতদিন না আচ্ছা করে ধোলাই করা যায়, ততদিন আর সোয়াস্তিতে থাকার যো নেই। দেখা যাক কী করা যায়। কয়েক বছর আগেই উইলিয়ম পিট পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিল, ফ্রান্স যতদিন ধ্বংস না হয়, ততদিন ইংল্যান্ড তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

অথচ ইংল্যান্ডের সাথে কোনো বিরোধিতা করতে চায় নি নেপোলিয়ন। যুদ্ধ চায় নি, সংগ্রাম চায় নি। ইতালি অভিযানের আগে সে যে ইংল্যান্ডের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, তা ছিল শান্তির প্রস্তাব, বন্ধুত্বের প্রস্তাব। কী দরকার ইউরোপের দুটো শ্রেষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে বিরূপতার পাঁচিল তুলে দেওয়ার। 'আসুন আমরা শত্রুতা ভুলে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হই...।' নেপোলিয়নের এতখানি উদার, প্রীতিপূর্ণ আহ্বানের জবাবে তৃতীয় জর্জ তাঁর মন্ত্রী গ্রেনভিলকে কী জানালেন? জানালেন, 'সেই কর্সিকান দস্যুটা একটা চিঠি পাঠিয়েছে...।'

ইংল্যান্ডের দিক থেকে ফ্রান্সের বন্ধুত্বের প্রস্তাব এইভাবে ছুড়ে ফেলা হল। নেপোলিয়ন তখন রাশিয়া, তুর্কি, অস্ট্রিয়া ইত্যাদির সাথে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হল। রাশিয়া আর তুর্কির ব্যাপারে কোনো গোলমাল হল না। তবে অস্ট্রিয়াকে ক্রমাগত উস্কানি দিতে লাগল ইংল্যান্ড। খবরদার, ফ্রান্সের সাথে কোনো বোঝাপড়া নয়। এমনকি অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য টাকা পর্যন্ত পাঠাল। তবে কোনো ফল হল না। ১৮০১ সালে ফ্রান্সের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হল অস্ট্রিয়া। ঝড় উঠল ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে। কেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড যুদ্ধটাকে জিইয়ে রেখেছে? কেন ফ্রান্সের শান্তির প্রস্তাবকে নাকচ করা হল? কেন? জবাব চাই। ঠিক ওই সময় প্রধানমন্ত্রী পিটের সাথে রাজা তৃতীয় জর্জের মতবিরোধ হওয়ায় পদত্যাগ করল পিট। তার বদলে এল এডিংটন। এডিংটন ফ্রান্সের সাথে শান্তি স্থাপনে আগ্রহ দেখাল। এই ব্যাপারে এগিয়ে যাবার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসকে পাঠাল। শেষ পর্যন্ত ১৮০২ সালের মার্চ মাসে যে-সন্ধিটা হল, তার নাম অ্যামিয়েন্সের সন্ধি। সন্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল ইংল্যান্ড ফ্রান্সকে মাল্টা দ্বীপ ফিরিয়ে দেবে। ফ্রান্সও তার বদলে কিছু হাতছাড়া করবে। কূটনৈতিক দূত বিনিময় হল দু দেশের মধ্যে। সন্ধির সম্মানে ভোজ দেওয়া হল।

কিন্তু ক দিন? ক বছর? বিষণ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ করল নেপোলিয়ন, ইংল্যান্ডের দিক থেকে অ্যামিয়েন্সের সন্ধির শর্ত পালনের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। মাল্টা দ্বীপে ইংরেজ সৈন্য যেমন ছিল তেমনই আছে। অথচ নেপোলিয়নের দিক থেকে যা কিছু ফিরিয়ে দেবার তা সে সবই দিয়েছে। ইংল্যান্ডের এই ইচ্ছাকৃত নিরাসক্ত ভাব চিন্তিত করে তুলল নেপোলিয়নকে।

আর ধৈর্য ধরতে পারল না সে। বেশ কড়া সুরে ইংল্যান্ডকে বলে পাঠাল, 'অ্যামিয়েন্সের

সন্ধির শর্ত পালনে ইংল্যান্ড যদি আর এতটুকু দেরি করে তাহলে সে উচিত শিক্ষা পাবে...।'

নেপোলিয়নের এই হুমকিকে ভয় পেতে ইংল্যান্ডের বয়ে গেছে। বরঞ্চ সে এবার অন্য জায়গায় নষ্টামি করতে লাগল। উদ্দেশ্য, নেপোলিয়নকে খোঁচানো। সুইজারল্যান্ড জয় করে নেপোলিয়ন এক উদার শাসনব্যবস্থা চালু করেছিল। আগে ক্যান্টনগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল অভিজাত বড়লোকের। এই অন্যায় আধিপত্যে ঘা মেরে নেপোলিয়ন জনসাধারণের অধিকারকে বড় করে তুলল। তাদের এতদিনকার জমে থাকা অভাব-অভিযোগ দূর করল। দুহাতে তাদের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও বাহবা কুড়োল। অতএব জ্বলেপুড়ে গেল ইংল্যান্ড। ঈর্ষার আগুনে পুড়তে পুড়তেই সে উস্কানি দিতে লাগল সুইজারল্যান্ডের অভিজাতদের। শুরু হল গৃহবিবাদ অর্থাৎ সফল হল ইংল্যান্ডের নীতি।

এই নষ্টামি সহ্য করতে পারল না নেপোলিয়ন। সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দমন করল সুইজারল্যান্ডের গৃহবিবাদ। ওখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে নিয়ে আলোচনা করে 'অ্যাক্ট অব মেডিয়েন' নামে একটা শাসননীতি চালু করল। এই নীতি অনুযায়ী ক্যান্টনগুলোকে বিস্তৃত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হল। সবশেষে পঞ্চাশ বছরের একটা অনাক্রমণ চুক্তি হল দু দেশের মধ্যে।

চটে লাল হয়ে গেল ইংল্যান্ড। যত রকমভাবে পারল নেপোলিয়নকে নীচু করতে চাইল। রাজ্যলোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী—এসব তো বললই—তাছাড়া নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর নানারকম কুৎসিত কটাক্ষপাত করা হল—যাকে বলে চরিত্র হনন। ইংল্যান্ডের কাগজে বেরল, 'সাদা-কালোর সংমিশ্রণে নেপোলিয়নের জন্ম। অর্ধেক ইউরোপীয়, অর্ধেক নিগ্রো।' ব্যঙ্গচিত্রে নেপোলিয়নকে দেখানো হল একটা হলদে চামড়ার কুতকুতে বামন। নাকটা ইয়া বড়। এছাড়া সাংঘাতিক হল যখন জোসেফাইন আর পল বারাসের নাম জড়িয়ে কুৎসিত সব গল্প-কাহিনী রচিত হল। এমনকি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী ফরাসিদের উত্তেজিত করবার জন্য ইংল্যান্ড তাদের ঘুস দিতে পর্যন্ত কসুর করল না। যুদ্ধ করার মধ্যে একটা পৌরুষ আছে। কিন্তু ইংরেজদের এ কী জঘন্য, অশ্লীল ব্যবহার!

দুর্ভাবনায় পড়ল নেপোলিয়ন। এত কষ্ট এত পরিশ্রম করে যে-উদার, প্রজাহিতৈষী শাসনতন্ত্র গড়ে তুলেছে, ইংল্যান্ড তো তাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করছে। অতএব অ্যামিয়েন্সের সন্ধি করে যে শান্তি ও বহু আকাঙ্ক্ষিত ইংরেজদের বন্ধুত্ব চেয়েছিল, তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

'ব্যাপারটা কী, একটু খোলসা করে বলুন তো?' ফ্রান্সে অবস্থানকারী ইংরেজ দূত হুইটওয়ার্থকে সরাসরি প্রশ্ন করল নেপোলিয়ন, 'এমন শুরু করেছেন কেন আপনারা?'

জবাবে একগাদা দাবির ফিরিস্তি দিল হুইটওয়ার্থ ...মাল্টা দ্বীপ ছাড়ব না, অন্তত দশ বছরের আগে তো নয়ই। ফরাসি অধিকৃত ল্যামপেডুসা নামে দ্বীপটা আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এছাড়া হল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ড থেকে ফ্রান্সকে সরে দাঁড়াতে হবে...। এই দাবি পূরণ করা হবে কি না তা সাত দিনের মধ্যে জানাতে হবে।

ইংল্যান্ডের এই ব্যবহারে পাথর বনে গেল নেপোলিয়ন। কিন্তু এর পরেও সে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল ইংল্যান্ডকে। এমনকি অ্যামিয়েন্সের সন্ধির শর্তাবলি একটু এদিক-ওদিক করে মাল্টা ইংরেজদের হাতেই রাখতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ১৮০৩ সালের ১৮ মে অভিয়েন উপসাগরে হঠাৎ দেখা গেল দুটো নিরীহ ফরাসি জাহাজকে আটকে ফেলেছে। এরপর নেপোলিয়নের পক্ষে যুদ্ধ শুরু করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

সব দেখেশুনে নেপোলিয়ন এবার নিজের সম্পর্কে ভাবতে বসল। ভাবতে বাধ্য হল। দশ বছরের জন্য প্রথম কন্সাল হয়েছিল সে। তারপর নিজেকে যাবজ্জীবন কন্সাল পদে অভিষিক্ত করল। স্থির করল, আজীবন সে শাসকই থাকবে। ফ্রান্সের মঙ্গল করবে, উন্নতি করবে। তার উপাধি পাল্টাবে। আর প্রথম কন্সাল নয়, এবার 'সম্রাট' হতে হবে। মর্যাদা বাড়বে তাতে।

প্রথম আপত্তি জানাল স্ত্রী জোসেফাইন। ঘোর আপত্তি। জোসেফাইন বুদ্ধিমতী। একটা জিনিস সে ঠিকই বুঝেছিল, নেপোলিয়ন সম্রাট হলে স্বাভাবিকভাবেই জোসেফাইন হবে সম্রাজ্ঞী। কিন্তু হবে কী? জোসেফাইন যে আজ পর্যন্ত স্বামীকে একটা সন্তান দিতে পারে নি। সম্রাট–পিতার উত্তরাধিকারী তো চাই। পিতার পর সিংহাসনে পুত্র আসবে, এটাই তো নিয়ম। ভয় পেল জোসেফাইন। নেপোলিয়ন যদি অন্য চিন্তা করে? অভিষেকের আগেই যদি বিচ্ছেদ করে? তাহলে? দরকার নেই বাপু সম্রাট স্বামীর। নেপোলিয়ন প্রথম কন্সাল হয়েই থাকুক।

কিন্তু কোনো বাধা মানল না নেপোলিয়ন। সম্রাট সে হবেই। রাজকীয় উপাধি তাকে নিতেই হবে। তবে সম্রাট হবে রাজ্যের নয়, ফরাসি জাতির।

রাজা হতে গেলে মাথায় রাজমুকুট পরতে হবে। রাজ্যাভিষেক চাই। আর অভিষেকে পোপের উপস্থিতি অত্যন্ত দরকার। অভিষেক তো যেমন-তেমন ব্যাপার নয়। একটা পবিত্র অনুষ্ঠান।

পোপ সপ্তম পায়াসকে রোম থেকে ফ্রান্সে আসবার জন্য আহ্বান জানাল নেপোলিয়ন। কারণ অভিষেক হবে ফ্রান্সের নটরড্যাম চার্চে। এবার ঠিক করতে হবে নেপোলিয়নের রাজকীয় প্রতীক কী হবে। সিংহ? হাতি? চিতাবাঘ? নাকি সাধাসিধে একটা মোরগ? অনেক আলোচনা হল। নেপোলিয়নের আর পছন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, তার রাজকীয় প্রতীক হবে ঈগল। দুদিকে দুটো বৃহৎ পাখা মেলে–দেওয়া তীক্ষ্ণঠোঁট ঈগল পাখি। সুন্দর! চমৎকার প্রতীক! রাজোচিত প্রতীক! নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত প্রতীক হল মৌমাছি। নিশ্চয়ই অফুরন্ত অনলস পরিশ্রমের প্রতীক। প্রাচীন রোমীয় ফ্যাশনে লরেল পাতা মালা করে রাজমুকুট তৈরি হল। এ পাতা অবশ্য গাছের সবুজ পাতা নয়। গোটাটাই খাঁটি সোনার।

শুরু হল রাজকীয় অভিষেকের আয়োজন। নেপোলিয়ন একটু বেশি জাঁকজমক অনুষ্ঠান দেখতে চাইল। ফরাসিরা তো দেখবেই, আরো দেখবে ইউরোপের রাজা–মহারাজারা। দেখবে ইংল্যান্ড। তবেই না তারা নেপোলিয়ন নামে লোকটাকে একটু সমীহ করতে শিখবে।

অভিষেকের দিন স্থির হল ১৮০৪ সালের ২ ডিসেম্বর। ঝকঝকে সকালে ঘুম ভেঙে গেল নেপোলিয়নের। বিছানা থেকে উঠে রুটিনমাফিক সব কাজকর্ম সেরে নতুন জামাকাপড় পরল—দুধের মতো সাদা সিল্কের। তার ওপর লালরঙের হাতকাটা জ্যাকেট। তাতে রাশিয়ান ফারের পাইপিং আর এমব্রয়ডারি করা গোলাপি মৌমাছি। মাথায় পরল সাদা পালক–বসানো কালো ফেল্ট টুপি।

নেপোলিয়নের ভাইদের কাছেও আজকের দিনটা বিশেষ স্মরণীয়। তারাও সবাই সেজেগুজে এল। জোসেফাইনও সাজল। হীরে–বসানো একটা ব্যান্ড দিয়ে গোছা করে চুল বাঁধল। রুচি আর পছন্দ দিয়ে রানীর মতো করে সাজল। তারপর একটা আট–ঘোড়ায়–টানা গাড়িতে গিয়ে স্বামীর পাশে বসল। বেলা তখন দশটা। প্যারিসের রাস্তা দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল গাড়ি। রাস্তার দুপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা জনতারা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল তাদের।

ঠিক দুপুরবেলা নটরড্যাম চার্চে প্রবেশ করল নেপোলিয়ন আর জোসেফাইন। ধীরপদে এগিয়ে গেল দুজন। সামরিক ব্যান্ডে বেজে উঠল অভিষেকের গান। উপস্থিত বিরাট জনতা সোল্লাসে শুভেচ্ছা জানাল, 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন।'

শুরু হল অভিষেক প্রার্থনা। পবিত্র তেল নিয়ে নেপোলিয়ন ও জোসেফাইনকে অভিষিক্ত করলেন পোপ। শরীরের নটা জায়গায় তৈলস্পর্শ ঘটানো নিয়ম। নেপোলিয়নের ইচ্ছেয় শুধু দুটো জায়গায় তেলের স্পর্শ দেয়া হল। ভুরুর ওপর এবং হাতে। আরো কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডের পর নেপোলিয়নের বিচারদণ্ড, রাজদণ্ড ও তরবারি তুলে দিলেন পোপ। এরপর নেপোলিয়ন একা একা এগিয়ে গেল অভিষেক-বেদির সিঁড়িতে। সবার দৃষ্টির সামনে অভিষিক্ত নেপোলিয়ন নিজের দু হাতে তুলে নিল সোনার লরেল পাতার রাজমুকুট। তারপর ধীরে ধীরে সেই মুকুট পরিয়ে দিল নিজের মাথায়। নেপোলিয়নের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ।

নেপোলিয়ন রাজার ঘরে জন্মায় নি। কোনোদিন রাজপুত্রও ছিল না। নিজের পুরুষকার বলেই যখন সে অভিষেক-বেদির কাছে এসে পৌঁছল এবং রাজকীয় মুকুটও নিজ হাতে নিজের মাথায় পরিয়ে দিল, তখন এতে আর বিস্ময়ের কী আছে? বরং নিয়মনীতির এই ব্যতিক্রমে নেপোলিয়ন নিজেকে সম্মানিত করেছিল। নিজের ব্যক্তিত্বের মহিমাকে পাঁচজনের সামনে আরো স্পষ্ট করেছিল। নেপোলিয়নের এই অভাবনীয় ব্যাপারে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন পোপ, সন্দেহ নেই। উপস্থিত জনতা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। তবু নেপোলিয়ন এতটুকু ইতস্তত করে নি নিজের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষকে শ্রদ্ধা জানাতে। ফ্রান্সের রাজকীয় ইতিহাসে এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইল সে। কেঁপে উঠল নটরড্যাম চার্চ—সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন। জোসেফাইনের দিকে তাকাল নেপোলিয়ন। জোসেফাইনও তাকাল স্বামীর মুখের দিকে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেল অভিষেক-বেদির দিকে। জানু পেতে, হাত জোড় করে মাথা নিচু করে বসল। নেপোলিয়ন আরো একটা স্বর্ণমুকুট তুলে নিল হাতে, তারপর ধীরে ধীরে পরিয়ে দিল জোসেফাইনের মাথায়। জোসেফাইনও তো আজকে মহীয়সী রানী। দু চোখ ভিজে গেল অভিভূত জোসেফাইনের।

আরো কিছু অনুষ্ঠানের পর ভেতরে চলে গেলেন পোপ তাঁর কাপড় ছাড়তে। উঠে দাঁড়াল নেপোলিয়ন। প্রার্থনাপুস্তক স্পর্শ করল। তারপর উচ্চকণ্ঠে শপথ নিতে লাগল।

বিশ্বস্ততার আবেগে বারবার কেঁপে উঠল তার কণ্ঠস্বর। শিহরন লাগল নটরড্যাম চার্চের বিরাট স্তম্ভগুলোর গায়ে।

শেষ হল অভিষেক। ট্যুইলারির প্রাসাদে ফিরে গেল তারা। নেপোলিয়ন 'সম্রাট' উপাধি নিল, অভিষেক হল, কিন্তু তাতে তার কোনো পরিবর্তন হল না।

'ভেলভেটে মোড়া এক টুকরো কাঠ এই তো সিংহাসন।' রাজসিংহাসন সম্পর্কে এই নিরাসক্ত মন্তব্য করেছিল নেপোলিয়ন। জোসেফাইন একবার এক চিঠিতে স্বামীকে 'সম্রাট' বলে সম্বোধন করেছিল। আপত্তি জানিয়েছিল নেপোলিয়ন, 'আমি যা ছিলাম তাই আছি। আমাকে সম্রাট বলে সম্বোধন করার দরকার নেই। কিছুই বদলায় নি।' নেপোলিয়ন চেয়েছিল প্রজার কল্যাণ কামনায় যে শান্তিটুকু থাকা দরকার, তাই যেন থাকে। দেশের নিরাপত্তা যেন বিপন্ন না হয়।

কিন্তু বিপন্ন হল। বিপদটা এল ইংল্যান্ডের দিক থেকে। প্রধানমন্ত্রীর পদে তখন আবার পিট ফিরে এসেছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উঠতি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। টাকা খরচ করে, কূটনীতির সাহায্য নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক

শক্তিজোট গড়ে তুলল সে। এই জোটের মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, সুইডেন আর নেপল্‌স। জোটবদ্ধ হতেই হবে। কারণ নেপোলিয়ন 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণে একা ইংল্যান্ড নয়, ইউরোপের অন্যান্য রাজারাও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আর দেরি নয়। নেপোলিয়ন অজেয়, অদমনীয় হবার আগেই তাকে খতম করে দিতে হবে। ১৮০৪ সালে এই জোটবদ্ধ শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্র ব্যাভেরিয়ার ওপর।

শুরু হল যুদ্ধ। বেশ কয়েক বছর চলল। বারুদের গন্ধে ভারি হল আকাশ-বাতাস।

নেপোলিয়ন একবার দুঃখ করে বলেছিল, 'আমি আমার নিজের ইচ্ছেয় কখনো কিছু করতে পারি নি। আমাকে জীবনভর পরিস্থিতির নির্দেশে চলতে হয়েছে।' সত্যিই তাই। নেপোলিয়ন শান্তি চেয়ে, মৈত্রী চেয়ে শুধু যুদ্ধই পেয়েছে।

প্রস্তুত ছিল সে। শুরু হল অভিযান। এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে চার শ মাইল পাড়ি দিয়ে ব্যাভেরিয়ায় পৌঁছল নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী। অস্ট্রিয়া তখন পর্যন্ত বুঝত পারে নি কত বড় আঘাত নেমে আসছে তার ওপর। সেনাপতি ম্যাক একেবারে হকচকিয়ে বোকা বনে গেল যখন ফরাসি সেনারা বিদ্যুতের মতো তার সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে আহত করল, তারপর চলে গেল। অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখল ম্যাক, অস্ট্রীয় সেনাবাহিনী থেকে কীভাবে ঊনপঞ্চাশ হাজার সৈন্য বন্দি হয়ে চলে গেল ওদিকে। শুধু কি এটুকুই? আরো সাড়ে তিন শ মাইল পুবে এগিয়ে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা দখল করে ফেলল নেপোলিয়ন। রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল অস্ট্রিয়াধিপতি দ্বিতীয় ফ্রান্সিস।

পালিয়ে গিয়ে রাশিয়ার জার আলেকজান্ডারের সাথে মিলিত হল সে। দুজনে একাত্ম হল। ভাবল, এবার দুই বন্ধুর ঐক্যবদ্ধ আক্রমণে হাতপা ভেঙে দ হয়ে পড়ে থাকবে নেপোলিয়ন।

ভিয়েনার উত্তর-পুবে, সত্তর মাইল দূরে, অস্টারলিজে এসে দাঁড়াল দুই বন্ধুর সম্মিলিত বাহিনী। 'এবার এস, নেপোলিয়ন, দেখি কেমন বাপের বেটা...

নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা ছিল রুশ-অস্ট্রিয়ার মিলিত সৈন্যের অর্ধেক। কিন্তু অস্টারলিজের যুদ্ধও যেন একটা ভেল্‌কি, ম্যাজিক। নেপোলিয়ন এল, যুদ্ধ করল, জিতল। বন্দি হল সাতাশ হাজার শত্রুসেনা। আশিটা কামান এসে গেল নেপোলিয়নের হাতে। দুঃখে, বেদনায় কেঁদে ফেলল জার আলেকজান্ডার। তারপর চোখের পানি মুছে প্রেসবার্গের সন্ধি করতে বাধ্য হল।

'আশা করছি এখন থেকে ভেবেচিন্তে জোট বাঁধবে তোমরা।' মানচিত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল নেপোলিয়ন, 'আর তুমি কী করবে?' এবার প্রাশিয়ার ওপর চোখ রাখল সে। 'নির্বোধ ফ্রেডারিক উইলিয়াম, তুমি সত্যিই বোকা। নইলে একবার আমার দিকে, আরেকবার রাশিয়ার দিকে ঝুঁকছ কেন। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো বারবার এদিক-ওদিক দুলছ ...।'

আসলে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না। সে চলত রানী লুইজার নির্দেশে। রানী লুইজা রীতিমতো সামরিক পোশাক পরে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করত। তারই ইচ্ছেতে ইউরোপে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে আবার যখন ইংল্যান্ড, স্যাকসনী, রাশিয়া ও সুইডেনকে নিয়ে চতুর্থ শক্তিজোট হল, তাতে প্রাশিয়াও হাত মেলাল। না মিলিয়ে উপায় ছিল না। কারণ ইতোমধ্যে প্রাশিয়া নেপোলিয়নের কাছে জেনা ও অরস্টাড যুদ্ধে সাংঘাতিক হারা হেরেছে। শুধু কি প্রাশিয়া? নেপোলিয়নের এমন বিক্রম যে প্রায় একই সময়ে রাশিয়া হেরে গেল ফ্রিডল্যান্ডের যুদ্ধে। আলেকজান্ডার পড়িমড়ি করে নেপোলিয়নের সাথে টিলজিটের সন্ধি করতে বাধ্য হল।

টিলজিটের সন্ধি হয়েছিল নীমের নদীর বুকে, একটা জাহাজের কেবিনে। আলেকজান্ডারকে দেখে মুগ্ধ হল নেপোলিয়ন। বছর তিরিশ বয়স, নীল চোখ, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, কোমল-পেলব চেহারা। কথাবার্তায় অতি ভদ্র, ব্যবহার অভিজাত। নেপোলিয়ন একবার মন্তব্য করেছিল, 'আলেকজাণ্ডার যদি মেয়ে হত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তার প্রেমে পড়তাম।'

আলেকজান্ডারকে নেপোলিয়নের এত ভালো লাগল যে তার মনে হল ইউরোপে রাজ-রাজড়াদের মধ্যে যদি কাউকে বন্ধু বলে ডাকতে হয় তো সে এই জার আলেকজান্ডার।

আলেকজান্ডারও মুগ্ধ এই যুদ্ধবাজ লোকটাকে দেখে। লোকটা এত ভালো, এত অমায়িক ...! নেপোলিয়নকে একদিন সে নেমন্তন্ন করল। গল্প হল, খানাপিনা হল, আড্ডা হল। এরপর রাশিয়ার দূত সাদর অভ্যর্থনা পেল ফ্রান্সে। দুই পক্ষে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হল। নেপোলিয়নও তাই চাইছিল। ইউরোপে যদি একটু শান্তিতে থাকতে হয় তাহলে রাশিয়ার বন্ধুত্ব অপরিহার্য।

কিন্তু কোথায় শান্তি! বড় ধূর্ত এই ইংরেজ জাতি। সমুদ্রের রাজা ইংল্যান্ড। তাদের জন্য একটু শান্তিতে থাকার জো আছে কি? তারা চায় নেপোলিয়নকে সব সময় ব্যস্ত রাখ, তার বিরুদ্ধে শক্তিজোট কর।

সুতরাং যুদ্ধ চলছে, চলবে

এরই মধ্যে নেপল্‌স আর স্পেনকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে নেপোলিয়ন। এ দুটো রাজ্যেই ছিল বুরবোঁ বংশের আধিপত্য। শেষ হল এই আধিপত্যের। ১৮০৮ সালে ঠিক ঠিক বোঝা গেল নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি কতখানি বিস্তার লাভ করেছে। কতখানি? কতদূর? ইউরোপের মানচিত্র খুলে দেখা গেল, পশ্চিমে আটলান্টিকের তীর থেকে পুবে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত। আর উত্তরে হামবুর্গ থেকে দক্ষিণের রিজিও দ্য ক্যালব্রিয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ পুবে-পশ্চিমে দু হাজার মাইল, উত্তর-দক্ষিণে সাড়ে এগার শ মাইল ইউরোপীয় অংশ এখন নেপোলিয়নের হাতের মুঠোয়।

এর মধ্যে ছিল স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যান্ড, নেপল্‌স আর কনফেডারেসি অব রাইন অর্থাৎ ব্যাভেরিয়া, উরটেমবার্গ, ওয়েস্টফেলিয়া ইত্যাদি। বিজিত অঞ্চলের প্রতি ইঞ্চি মাটিতে সে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিল। প্রতিটা খুঁটিনাটির ওপর ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি।

এদিকে তো ভালোই চলছিল। কিন্তু স্থির থাকতে পারছিল না নেপোলিয়ন। কারণ কিছুতেই সে ইংল্যান্ডের সাথে পেরে উঠছিল না। কী অহমিকা ওই ইংরেজদের! এই তো মাত্র কয়েক বছর আগে, ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে পানির কী ঝাপটাটাই না মারল নেপোলিয়নের গায়ে। অর্ধেক ইউরোপ জয় করেও নেপোলিয়ন ভুলতে পারে নি সেদিনের কথা। ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসন মারা গিয়েছিল সেই যুদ্ধে। কিন্তু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগেও শুনে গেল ট্রাফালগারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয়, ফ্রান্সের পরাজয়।

কী করে ভুলবে নেপোলিয়ন ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ের সেই নিদারুণ অপমান? তাই বলে কি ইংল্যান্ডের এই দম্ভ সহ্য করতে হবে? তার সবরকম বিরোধিতার ভূমিকা মানিয়ে নিতে হবে? মানতে হবে না ঠিকই, তবে একটা জিনিস নেপোলিয়ন ঠিকই বুঝেছিল, যত চেষ্টাই সে করুক না কেন, কিছুতেই ইংল্যান্ডকে নৌযুদ্ধে হারাতে পারবে না। পারবে না ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে পা ফেলতে। তবে?

ভাবতে শুরু করল নেপোলিয়ন। তারপর সত্যিই পথ একটা খুঁজে পেল। লাফিয়ে উঠল সে। 'এবার বুঝতে পারবে, ইংরেজ, কেমন জব্দ করি তোমাদের। তোমাদের হাতে মারব না ঠিকই, তবে ভাতে মারব।'

কিছুদিন পরেই আসল ব্যাপারটা বোঝা গেল। বার্লিন থেকে হঠাৎ একদিন নেপোলিয়ন ঘোষণা করল, ফ্রান্সের মিত্ররাষ্ট্রের একটা জাহাজও যেন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং কোনো ব্রিটিশ উপনিবেশে না যায়, খবরদার। ব্রিটিশ এলাকা এখন থেকে অবরুদ্ধ এলাকা। ইউরোপের বাণিজ্য জগতে এখন থেকে তার প্রবেশ নিষেধ। এখন সে একঘরে। যদি কোনো জাহাজকে ওই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকতে দেখা যায় তাহলে সেই জাহাজ, জাহাজের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য সেই মুহূর্তে বাজেয়াপ্ত হবে।' এই ঘোষণা 'বার্লিন ডিক্রি' নামে পরিচিত। ঘোষণাকাল ১৮০৬ সালের ২১ নভেম্বর।

ইংল্যান্ডকে বাণিজ্য জগতে এইভাবে বয়কট করার নীতির নাম কন্টিনেন্টাল সিস্টেম। নেপোলিয়ন বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ। অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে ইংল্যান্ডকে জব্দ করার কৌশল সে ঠিকই বের করেছিল। কিন্তু একটা জিনিস তলিয়ে বুঝতে ভুলে গিয়েছিল যে, ইংল্যান্ডের সাথে সে দ্বন্দ্বে পারে নি, তার প্রধান কারণ ইংল্যান্ডের প্রবল নৌশক্তি। ইংল্যান্ডকে জব্দ করার জন্য নেপোলিয়ন যে-কৌশলটা নিয়েছে তার খেলাটাও তো সেই সমুদ্রের ওপরেই—যার ওপর কিনা ইংল্যান্ডের সদম্ভ চলাফেরা। সুতরাং ইংল্যান্ডকে সমুদ্রপথে জব্দ করবার সাহস নেপোলিয়ন কোথায় পেল? সে প্রায় হাতে হাতেই প্রমাণ পেয়ে গেল সমুদ্রে ইংল্যান্ড কতখানি শক্তি ধরে। পরপর কয়েকটা পাল্টা ঘোষণা জারি করল ইংল্যান্ড। তাতে বলা হল, ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্রগুলোর কোনো জাহাজকে বন্দরে ঢুকতে দেখলেই ইংল্যান্ডের দিক থেকে তাকে বাজেয়াপ্ত করা হবে। অতএব, তারা যেন একটু বুঝেসুঝে চলে। অর্থাৎ নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে যে চালটা দিয়েছিল, সেটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে এল নেপোলিয়নের নিজের বুকে। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে এই যে দম্ভ, এটা নৌবলে বলীয়ান ইংল্যান্ডের সাজে, ফ্রান্সের সাজে না। শ্যেনচক্ষু মেলে সমুদ্রের বুক চষে বেড়াতে লাগল ব্রিটিশ জাহাজ।

১৮০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মিলান থেকে আবার একটা আদেশ জারি করে 'বার্লিন ডিক্রি'কে আরো কঠোর করে তুলল নেপোলিয়ন। ভাবল, যতই যাই হোক না কেন, ইংল্যান্ডকে তো বাণিজ্য করেই পেট চালাতে হবে। কতদিন সে অবরুদ্ধ অবস্থায় একঘরে হয়ে বাণিজ্য না করে থাকতে পারবে—যতই সে সমুদ্রের বুকে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়াক।

মারাত্মক, মারাত্মক ভুল করল নেপোলিয়ন। বার্লিন ও মিলান থেকে এইসব ঘোষণা করবার আগে তার উচিত ছিল দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনটা আরেকটু খতিয়ে দেখা; আরেকটু তলিয়ে বোঝা যে, সত্যিই কন্টিনেন্টাল সিস্টেমে ইংল্যান্ড জব্দ হবে কিনা। কী করে হবে। ইংল্যান্ডে তখন শিল্পবিপ্লব হয়ে গেছে। তার ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলেফেঁপে উঠেছে। ইউরোপের সব কটা দেশ তখন ইংল্যান্ডের সাথে একটু বাণিজ্যিক সম্পর্ক পাতানোর জন্য মুখিয়ে আছে। এই অবস্থায় নেপোলিয়ন মিত্র রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশে আদেশ জারি করল, 'খবরদার, ইংল্যান্ডের সাথে কোনো বাণিজ্য নয়, এই বিষয়ে তার সাথে একটা কথাও নয়।' এতে ইংল্যান্ড যত না জব্দ হল, তার চাইতে বেশি জব্দ হল নেপোলিয়নের অনুগত মিত্রপক্ষীয়েরা।

নেপোলিয়নের জীবনে প্রথম নিয়তি নেলসন তথা ব্রিটিশ নৌশক্তি। দ্বিতীয় নিয়তি এই কন্টিনেন্টাল সিস্টেম। দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয়টা একবারে নেপোলিয়নের নিজের হাতে তৈরি। ভুল, মহাভুল করল নেপোলিয়ন। এরপর শুরু হল ভুলের পর ভুল।

ইংল্যান্ডের নৌবল একের পর এক ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোর জাহাজ আটক করতে লাগল। অন্যদিকে নেপোলিয়নের কাছে আবেদনের পর আবেদন আসতে শুরু করল তার মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে, 'অবরোধ তুলে নিন, নইলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা কি না খেয়ে মরব নাকি?'

আবেদন-নিবেদনে কোনোই ফল হল না। আরো কঠোর হল নেপোলিয়ন। কিন্তু কল্পনাও করতে পারল না, তার বন্ধু-রাষ্ট্রগুলো কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে ইংল্যান্ডের সাথে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডকে ভাতে মারবার যে কৌশল করেছিল, তা একেবার মাঠে মারা গেল। শুধু তাই নয়, এরই ফলে সৃষ্টি হল একের পর এক জটিলতা, খোঁড়া হল ভুলের গহ্বর।

নেপোলিয়নের জীবনে এর পরের ভুল পোপের সাথে বিবাদ। কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের ফলে পোপের অধিকারে যেসব বন্দর ছিল সেখানেও ব্রিটিশদের প্রবেশ নিষেধ করে এক নির্দেশ জারি করা হল। এই নির্দেশ মানতে রাজি হলেন না পোপ। চটে গেল নেপোলিয়ন। কেড়ে নিল পোপের সমস্ত জাগতিক অধিকার। বলতে গেলে তাঁকে নজরবন্দি করে রাখল। নেপোলিয়নের এই ব্যবহার দারুণ আঘাত হানল পোপের পদমর্যাদায়। মরিয়া হয়ে এবার তিনি তাঁর ধর্মীয় অস্ত্র হানলেন। নেপোলিয়নকে বহিষ্কারদণ্ড দিলেন। অর্থাৎ ধর্মজগতে একঘরে করা হল নেপোলিয়নকে। পোপের এই দণ্ড নেপোলিয়নের জয়ের পথে কাঁটা বিছিয়ে দিল। কারণ ধর্মীয় গুরুকে মানুষ এই অতি আধুনিক যুগেও ঈশ্বরের অংশ বলেই বিশ্বাস করে। কন্টিনেন্টাল সিস্টেম প্রয়োগ করার ফলে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে পোপের এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রকাশ—নেপোলিয়নের অলক্ষে তার জীবনে এক বিরাট ঝড়ের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে এল। একচক্ষু হরিণের মতো নেপোলিয়ন এই নীতি প্রয়োগ করার দিকেই শুধু নজর রেখেছিল আর উল্লসিত হচ্ছিল, ওদিকে আকাশের গায়ে যে লালচে মেঘ জমে উঠেছিল, সেইদিকে আর চোখ পড়ে নি।

পোর্তুগাল এই কন্টিনেন্টাল সিস্টেম মানতে রাজি হল না। কী করে মানবে? পেটের জ্বালায় মরতে হবে যে! নেপোলিয়ন কিন্তু পোর্তুগালের এই অবাধ্যতা দেখে একেবারে থ' বনে গেল। সাথে সাথে তাকে আক্রমণ করে কব্জা করে ফেলল। একই সাথে কব্জা করল স্পেনকে, যে স্পেন চিরকাল নেপোলিয়নের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছে। আসলে স্পেনীয় মন্ত্রী গডয়, স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লস ও রাজপুত্র ফার্দিনান্দের অন্তঃকলহের কারণেই এমনটা হতে পারল। চতুর্থ চার্লস সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হল। গডয় পালিয়ে গেল। ফার্দিনান্দ বসল সিংহাসনে। কিন্তু বসে থাকতে পারল না। নেপোলিয়ন কৌশলে তাকে সরিয়ে বড় ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে বসাল সেখানে।

স্বজনপ্রীতির এমন প্রকাশ্য উদাহরণ দেখানোর বুদ্ধি নেপোলিয়নের মাথায় এসেছিল সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিল বলেই। থাক, একেবারে হাতের মুঠোয় স্পেন আর পোর্তুগাল থাক। সমুদ্রের ধারে এই দেশ দুটো প্রত্যক্ষ অধীনে থাকলে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কার্যকর করা সহজ হবে। নেপোলিয়ন তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দরোজা বন্ধ করে কেবল তাকিয়ে ছিল ইংল্যান্ডের দিকে। তাকে গলা টিপে মারতে হবে এখানে বসে। 'ইংরেজ, তোমাকে আমি জব্দ করব এখানে বসে। তোমাকে মারবার জন্য আমাকে আর ইংল্যান্ডে যেতে হবে না'—এই ছিল নেপোলিয়নের মনের কামনা, একাগ্র সাধনা। সুতরাং স্পেনের সিংহাসন থেকে বুরবোঁ

রাজাকে উৎখাত করে সেখানে নিজের ভাইকে বসানোর মধ্যে কোনো অন্যায় দেখল না নেপোলিয়ন। কিন্তু ঝড় উঠল এখান থেকেই।

নেপোলিয়ন যতদিন স্পেনে উপস্থিত ছিল ততদিন স্পেনীয়রা গজগজ করলেও চুপ করে ছিল। কিন্তু কয়েকজন সেনাপতির ওপর ভার দিয়ে যে–মুহূর্তে সে স্পেন ছেড়ে চলে এল, সেই মুহূর্তেই সেখানে শুরু হল বিপর্যয়। সশস্ত্রভাবে রুখে দাঁড়াল স্পেনীয়রা। ফরাসিদের পরাজিত করে প্রথমে ভ্যালেনসিয়া, পরে বেলন উদ্ধার করে ফেলল তারা। মাদ্রিদ চলে গেল স্পেনীয়দের হাতে। জোসেফ বোনাপার্ট সদ্য–লাভ–করা সিংহাসন ও রাজ্যপাট ছেড়ে পালিয়ে গেল স্পেন থেকে। কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল সব। খবর পাওয়ামাত্র ছুটে এল নেপোলিয়ন। নিজের অধিকার আবার স্থাপন করল বটে, তবে স্থায়ী হল না। কেননা তখন সারা ইউরোপে একটা উল্লাসের ঢল নেমে এসেছে। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে স্পেনীয়রা পরাজিত করেছে, এই সংবাদে চমকে উঠল গোটা ইউরোপ। নেপোলিয়নের স্থলবাহিনী তাহলে অপরাজেয় নয়? তাদেরও তাহলে হঠানো যায়? স্পেন আর পোর্তুগাল যেন সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেল। অবশ্য সেই সুধার অনেকটাই জোগান দিচ্ছিল চতুর–চালাক ইংল্যান্ড। এবং ইংল্যান্ডের সাহস ও সমর্থনেই পোর্তুগাল আর স্পেন ভয়শূন্য হয়ে একসাথে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর বসল—ইতিহাসে যার নাম 'পেনিনসুলার ওয়ার' বা উপদ্বীপের সংগ্রাম, যে সংগ্রাম নেপোলিয়নের জীবনে তিন নম্বর নিয়তি। সময়টা ১৮০৮।

এতদিন নৌশক্তিতে ইংল্যান্ড অদ্বিতীয় ছিল। এবার তার ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হল আর্থার ওয়েলেসলি। ভারতবর্ষের এককালীন গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলির ছোট ভাই। ভারতবর্ষে দাদার আমলে মারাঠা আর মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হাত পাকিয়ে রেখেছিল আর্থার ওয়েলেসলি। উপদ্বীপের সংগ্রামে স্পেন আর পোর্তুগালের একেবারে পাশটাতে এসে দাঁড়াল সে। ইংল্যান্ড এবার স্থলযুদ্ধে অদ্বিতীয় নেপোলিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানাল।

১৮০৮ সালে আলেকজাণ্ডারের সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হল নেপোলিয়নের। নেপোলিয়ন তাকে অনেক করে বোঝাল যেন এই বিপদে সে ফ্রান্সের পাশে এসে দাঁড়ায়। আলেকজান্ডার ঘাড় কাত করল বটে, তবে বোঝাই গেল, এই ধরনের সম্মতি নেহাতই ভদ্রতার মুখোশ, অন্তরের সায় নয়। আলেকজান্ডার সায় দেবে কী করে! টিলজিটের সন্ধির বিরুদ্ধে তো তার নিজের মা, বোন, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাশিয়াসুদ্ধ সবাই। এই ক্ষেত্রে কী করে সে নেপোলিয়নের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে?

সবই বুঝল নেপোলিয়ন। টিলজিটের সন্ধি এখন স্মৃতিমাত্র। আলেকজাণ্ডারের বন্ধুত্ব অলীক। দুঃখিত হল নেপোলিয়ন। তবু মুখে কিছু বলল না। শুধু এমন একটা কিছু করতে চাইল যাতে ফ্রান্সের মর্যাদা আর নিরাপত্তা বাড়ানো যায়। কী করা যায় ...

তখন অনেক কিছুই ভাবছে নেপোলিয়ন। ভাবছে মিত্র চাই, চাই উত্তরাধিকারী। জোসেফাইন কোনো সন্তান দিতে পারে নি। কেন? পিতৃত্বের সাধ কোন্ পুরুষের না আছে? বিশেষ করে নেপোলিয়ন যে পারিবারিক জীবনকে বড় ভালবাসে। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, জোসেফাইন কখনো নেপোলিয়নের সন্তান পেটে ধরে নি। শোনা যায়, জোসেফাইন নাকি একবার বারান্দা ভেঙে পনের ফুট নিচে পড়ে যায় এবং তার শরীরের অভ্যন্তর ভাগ

আহত হয়। ডাক্তারের আশঙ্কা সে আর সন্তান ধারণ করতে পারবে না। তবে? চুপ করে কেবল ভাবলেই তো আর চলবে না। উপায় একটা চাই–ই চাই। যিনি সম্রাট তাকে তো শুধু বর্তমান দেখলেই চলবে না, ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে।

অনেক ভাবনাচিন্তার পর উপায় একটা বের করল। মনের মধ্য একটু খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল বটে, তবে রাজনীতিতে সব সময় অত মনের বালাই ধরলে চলে না। জোসেফাইনের সাথে বিবাহ–বিচ্ছেদ চাইল সে। বিচ্ছেদ করে কোনো এক রাজকন্যাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল, কারণ প্রথমত সন্তান চাই, দ্বিতীয়ত শ্বশুর রাজা হলে চরম বিপদের সময় পরম মিত্র হিসেবে পাশে এসে দাঁড়াবে। সাহায্য করবে, পরামর্শ দেবে। এ বড় কম কথা নয়। অতএব পাত্রী চাই—রাজকন্যা পাত্রী। পাত্রীর খোঁজে এদিক–ওদিক লোক পাঠাল নেপোলিয়ন। সবার আগে পাঠাল রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে। সেখানে ফরাসি দূত কলিনকোর্টের কাছে বলে পাঠাল, 'জার আলেকজান্ডারের বোন অ্যানার সবকিছু বর্ণনা দিয়ে আমাকে শিগ্‌গির খবর জানাও। খুব জরুরি। বয়স কত, স্বাস্থ্য কেমন, বিয়ের পর তাড়াতাড়ি সন্তান ধারণ করতে পারবে কি না ...।'

কলিনকোর্ট খবর পাঠাল, 'মেয়ের বয়স প্রায় ষোল। বেশ স্বাস্থ্যবতী। পাত্রী হিসেবে উপযুক্ত ...।

'তাহলে এখন আলেকজান্ডারের কাছে গিয়ে বিয়ের কথাবার্তা শুরু কর সময় নষ্ট কোরো না...' নির্দেশ পাঠাল নেপোলিয়ন।

জার আলেকজান্ডারের কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিল কলিনকোর্ট।

প্রথমটায় একটু চুপ করে রইল আলেকজান্ডার। তারপর বলল, 'আমি তো এই বিয়েতে এখনই রাজি। কিন্তু মুশকিল হবে মাকে নিয়ে। দেখি মার সাথে কথা বলে।'

আলেকজান্ডারের মা আর বড় বোন ক্যাথারিন—তারা আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে। সিদ্ধান্ত নিল। এবং তাদের সিদ্ধান্তই মেনে নিল আলেকজান্ডার।

তাড়া লাগাল নেপোলিয়ন, 'কী হল, কলিনকোর্ট? খবর পাঠাও, তোমার কাজ কতদূর এগোল।'

কলিনকোর্ট জানাল, 'না, কোনো সুবিধে হল না। নানারকম টালবাহানা করছে ওরা। বলছে, অ্যানা কি সুখী হবে? বিশেষ করে নেপোলিয়ন যেমন মেজাজে চলেন। তাদের ওইটুকুন মেয়ে কি পারবে অজানা রাজ্যে গিয়ে ওই মেজাজ সামাল দিতে? না, এখন বিয়ে নয়। মেয়ে আরেকটু বড় হোক। আঠার বছরে পা দিক, তারপর দেখা যাবে।'

বুঝতে পারল নেপোলিয়ন, রাশিয়া তাকে প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং রাশিয়ার সাথে আর নয়।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। বিয়ের মাধ্যমে মিত্রতা পাতানো তো রাজ–রাজড়াদের মধ্যে একটা চলতি রীতি। একদিকে উত্তরাধিকারীর ভাবনা, অন্যদিকে ইউরোপে একটু নিরাপত্তার জন্য, একটা মিত্র রাষ্ট্রের জন্য আকুলতা নেপোলিয়নকে অস্থির করে তুলল।

এবার অস্ট্রিয়ায় লোক পাঠাল সে। শুনেছে অস্ট্রিয়ার রাজা ফ্রান্সিসের একটা মেয়ে আছে। অষ্টাদশী—নাম মারি লুইজা।

অস্ট্রিয়ার দিক থেকে আপত্তির কিছু ছিল না। আপত্তি করবার সাহসও ছিল না। থাকবে কী করে? এই তো সেদিন, এক বছরও হয় নি, ওয়াগ্রামের যুদ্ধে নেপোলিয়নের হাতে কী মারটাই না খেল অস্ট্রিয়া! আর সাহস আছে নেপোলিয়নের কোনো কথা অগ্রাহ্য করার?

ফ্রান্সিসের সম্মতি দানের খবর পেয়ে প্রস্তুতি নিল নেপোলিয়ন। প্রথম জোসেফাইনের সাথে বিচ্ছেদ, তারপর আবার বিয়ে। জোসেফাইনের সাথে নেপোলিয়নের বিচ্ছেদ হল ১৫ ডিসেম্বর, ১৮০৯। ঠিক হল, এখন থেকে মালমাইসনের প্রাসাদে থাকবে জোসেফাইন। উপযুক্ত বৃত্তি দেওয়া হবে। ইতিহাস থেকে এবার চলে যাবে জোসেফাইন। আবার নতুন দাম্পত্য জীবন শুরু করবে নেপোলিয়ন। জোসেফাইন–কাহিনী এখন থাক এখন অন্য রানী অন্য জীবন

১৮১০ সালের মার্চ মাসে বিয়ে হল নেপোলিয়ন–মারি লুইজার। তার ঠিক এক বছর পর, অর্থাৎ ১৮১১ সালের ২২ মার্চ মাতৃত্বের যন্ত্রণায় কাতর হল মারি লুইজা। অস্থির মনে অপেক্ষা করতে লাগল নেপোলিয়ন। কখন খবর আসবে, কবার তোপধ্বনি হবে? একুশ বার। না, এক শ বার। মেয়ে না ছেলে? এক সময় সব উৎকণ্ঠা আর চিন্তার অবসান হল। তোপধ্বনি হতে লাগল। এক দুই... তিন, ক্রমে একুশ। একুশ বারেও থামল না তোপধ্বনি। থামল গিয়ে এক শ এক বারের পর। দু চোখ ভিজে গেল নেপোলিয়নের। এই প্রথম পিতৃত্বের স্বাদ। সারা দেশে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। মালমাইসন প্রাসাদে, জোসেফাইনের কাছে খবর পাঠাল নেপোলিয়ন, 'জান জোসেফাইন, আমার ছেলে হয়েছে। গাট্টাগোট্টা... স্বাস্থ্যবান, অবিকল আমার মতো। আমার মতো চোখ, মুখ, আমার মতো বুক...।'

নেপোলিয়ন এখন সুখী, খুব সুখী। অস্ট্রিয়া আর ফ্রান্সের মধ্যে যখন আত্মীয়তার বন্ধন, দু দেশের রক্তে জন্ম জুনিয়র নেপোলিয়নের, তখন তো অস্ট্রিয়া–ফ্রান্স একসাথে মিলেমিশে এক মস্ত বড় শক্তি। আর এই শক্তির সাহায্যে কী না করা যায়!

সে তো যায়। কিন্তু অন্যদিকে যে বড় গোলমাল। বড় দুঃসংবাদ। সেই যে উপদ্বীপের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৮০৮ সালে, সে–যুদ্ধে প্রথমটায় নেপোলিয়ন খুব সাহস ও দাপট দেখালেও শেষরক্ষা করতে পারল না। স্পেন ও পোর্তুগালের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থার ওয়েলেসলি যতটা মদদ দেবার দিতে লাগল। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত চলল এই উপদ্বীপের সংগ্রাম। আর এর প্রতিটা যুদ্ধই পরাজয়ের গ্লানি বয়ে নিয়ে এল নেপোলিয়নের জীবনে। বুঝতে পারল না সে, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে শুরু করেছে।

সত্যিই মাটি সরে যাচ্ছিল নেপোলিয়নের পায়ের নিচ থেকে। কারণ ইতোমধ্যে ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছিল আলেকজান্ডারের কানের কাছে। এর গোটাটাই ছিল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। নেপোলিয়নের সাথে কোনো সন্ধি নয়, প্রতিশ্রুতি নয়, বন্ধুত্ব তো নয়ই। এ বিষয়ে বেশি উস্‌কানি দিত লাগল অভিজাত আর দরবারি লোকেরা। আসলে তারা ভয় পেয়েছিল। নেপোলিয়ন ডাচি অব ওয়ারশ–তে যে–শাসননীতি চালু করেছিল, ইহুদিদের যে–রাজনৈতিক অধিকার এবং ভূমিহীন সার্ফদের যে–স্বাধীনতা দিয়েছিল, তাই দেখে রাশিয়ার সার্ফরাও যদি স্বাধীনতার অধিকার চেয়ে বসে তাহলে তাদের মাথার ওপর পা রেখে জমিদারদের আর ফুর্তি করা চলবে না। সুতরাং টনক নড়ল বড়লোকদের। যাতে রাশিয়ান সার্ফদের মধ্যে নেপোলিয়নের এতটুকু প্রভাবও না পড়ে, তারই চেষ্টা করতে লাগল তারা। না, নেপোলিয়নের সাথে আর কোনো ব্যাপারেই হাত মেলানো নয়। কিছুতেই না। বরঞ্চ পোল্যান্ডের যে–অংশটা নিয়ে নেপোলিয়ন ডাচি অব ওয়ারশ করেছে, আলেকজান্ডারের চেষ্টা হবে সেইটুকু উদ্ধার করে নিজেকে পোল্যান্ডের রাজা বলে ঘোষণা করা।

অথচ আলেকজান্ডার তখনো ভেবে দেখছিল, ঠিক এই মুহূর্তে নেপোলিয়নের বন্ধুত্বের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা উচিত হবে কি না। তার ইতস্তত ভাব দেখে সভাসদরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। একজন তো বলেই বসল, 'আপনি যদি আপনার এই মত না পাল্টান, তাহলে আপনার কপালেও আপনার বাবার মতো মৃত্যু লেখা আছে ...' রীতিমতো হুমকি।

আর দ্বিরুক্তি করল না আলেকজান্ডার। ইংল্যান্ডের সাথে সন্ধি করে ওয়ারশ আক্রমণের তোড়জোড় করতে লাগল সে। নেপোলিয়নের কাছে গ্র্যান্ড ডাচি অব ওয়ারশ থেকে একটা বিরাট দাবি করে বসল, অর্থাৎ যুদ্ধ লাগানোর ছুতো তৈরি করল।

নেপোলিয়ন তো দাবির বহর দেখে চটে লাল। এই সেদিন, বলতে গেলে বিনাবাক্যব্যয়ে রাশিয়ার হাতে গ্যালিসিয়া তুলে দিয়েছে। আবার নতুন আবদার? আর ধৈর্য ধরতে পারল না নেপোলিয়ন। ফ্রান্সে অবস্থানকারী রাষ্ট্রদূতকে ডেকে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিল, 'এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়ব না। দেখি তোমরা, সব খরগোশের পাল, কী করতে পার। জেনে রেখো, আমার হাতে এখন আট লক্ষ সৈন্য... কোন্ বন্ধু তোমাদের রক্ষা করে আমিও দেখে নেব।'

ফরাসি–রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হতে আর বাকি রইল না কিছু। জার আলেকজান্ডার ইংল্যান্ডের মৈত্রী তো পেয়েই ছিল, এবার বন্ধুত্ব পেল সুইডেনের—সুইডেনের রাজা ত্রয়োদশ চার্লসের। ১৮১২ সালের এপ্রিল মাসে মস্কো থেকে নেপোলিয়নের কাছে ঘোষণা পাঠানো হল, সে যেন আর কালবিলম্ব না করে গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশ ত্যাগ করে চলে যায়।

আগুন জ্বলে উঠবার সব ব্যবস্থাই করা ছিল। এখন তাতে জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁইয়ে দেয়া হল। ১৮১২ সালের ২৪ জুন নেপোলিয়নের বড় গর্বের গ্র্যান্ড আর্মি ভাসমান সেতুর সাহায্যে নীমেন নদী পার হতে শুরু করল। এই সেনাবাহিনীর মধ্যে ফরাসি সৈন্য তো ছিলই, আরো এসেছিল ইতালি, পোল্যান্ড, পোর্তুগাল, ব্যাভেরিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে। সবসুদ্ধ কুড়িটি জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এই গ্র্যান্ড আর্মি। সৈন্যরা যে–যার জাতীয় পোশাক পরেছিল। প্রতিটা রেজিমেন্টের সাথে ফরাসিদের রাজকীয় প্রতীক, দু দিকে পাখা মেলে দেওয়া ব্রোঞ্জের তৈরি ঈগল পাখি। তার নিচে সাদা সার্টিনের চতুষ্কোণ ফরাসি পতাকা, তিন পাশে সোনালি পাড় বসানো, তাতে সোনালি রঙের অক্ষর দিয়ে লেখা কত নম্বর রেজিমেন্ট, কী কী যুদ্ধ করেছে ইত্যাদি। পতাকার বাকি অংশ জুড়ে ইঞ্চিমাপের সোনালি রঙের মৌমাছি।

এই পাঁচ লক্ষ গ্র্যান্ড আর্মি ছাড়া আরেকটা বাহিনী ছিল নেপোলিয়নের। ইম্পেরিয়াল গার্ড। এই সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল বাছাই করা পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে। ঝকমকে পোশাক পরা এই সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরে না নেপোলিয়নের। প্রতিটা সৈন্যের ওপর কত ভরসা, কত–না নির্ভরতা!

প্রতি ডিভিশন সেনাদলের পেছনে রইল খাদ্য–রসদ সরবরাহকারী দল। প্রায় দু মাইল লম্বা। হবেই। কারণ এর মধ্য রয়েছে বহুসংখ্যক গরু–বাছুর, অনেক অনেক গমের গাড়ি, রুটি তৈরি করবার বেকারি, আরো কত কী। আগে খাদ্য, তারপর তো যুদ্ধ। এছাড়া রুশ অভিযানে ছিল তিন কোটি বোতল মদ। সঙ্গে কামান রয়েছে এক হাজার। রয়েছে যুদ্ধ করার প্রচুর সরঞ্জাম। তার সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স, স্ট্রেচার, চিকিৎসার সবকিছু। অস্থায়ী সেতু করতে হবে, সুতরাং, একটা কামারশালাও চলল সাথে। রুশ অভিযানে যেন কোনোকিছুর অভাব না পড়ে, কোনো ঘাটতি না থাকে। প্রত্যেক সিনিয়র, পদস্থ সামরিক অফিসারের রইল একটা করে

নিজস্ব গাড়ি। তাছাড়া বই, ম্যাপ, বিছানাপত্র নেবার জন্য ছিল মালগাড়ি আর গরুর গাড়ি। দুইয়ে মিলিয়ে হাজার ত্রিশেক। ঘোড়ার সংখ্যা ছিল দেড় লাখ। সব মিলিয়ে রুশ অভিযানটা ছিল বিশাল, অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিক।

বিরাট, বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল নেপোলিয়ন। তারপর এগিয়ে চলল। গ্রামের পর গ্রাম ধুলোবালিতে ভর্তি মাটির কুঁড়েঘর, একই চালার নিচে থাকে মানুষ, গরু, শুয়োর, হাঁস-মুরগি।

দু শ কামান নিয়ে অদূরে অপেক্ষা করছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার রুশ সৈন্যের একটা দল। তাদের সেনাপতি বার্কলে। বার্কলেকে ভিলনা নামে একটা জায়গায় আক্রমণ করবে বলে প্রস্তুত হল নেপোলিয়ন। ভিলনার দিকে এগিয়ে গেল সে। পৌঁছল—কিন্তু বার্কলে নেই। তার বিরাট সৈন্যদলেরও কোনো চিহ্ন নেই।

আসলে নেপোলিয়নের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের নীতি এড়িয়ে চলছিল বার্কলে। এদের আরো যে কী সর্বনাশা পরিকল্পনা ছিল সেটা নেপোলিয়ন বুঝতে পারল যতই সে রাশিয়ার ভেতরে এগিয়ে যেতে লাগল।

নেপোলিয়ন এবার এগিয়ে চলল রাশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর স্মোলেনেস্কের দিকে। বিশাল বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছেই থমকে গেল। সামনের পথ জুড়ে আগুন জ্বলছে। বিরাট আগুন। কার সাধ্য এগোয়। এ আগুন হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনার আগুন নয়। সেনাপতি বার্কলে ইচ্ছে করেই এ আগুন লাগিয়েছে। প্রথমটায় বেশ কিছু রুশ সৈন্য পুড়ে মারা গেল। স্মোলেনেস্ক শহরটাও পুড়ে গেল। তা যাক, শত্রুসৈন্যকে তো আটকে দেওয়া হল। কারণ আগুনে পোড়া শহরে আশ্রয় নেওয়া তো দূরের কথা, সেখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতেও কেমন লাগে। সেখানে আর এতটুকু অপেক্ষা করল না নেপোলিয়ন। আরো ভেতরে ঢুকল সে। যতই যেতে লাগল, ততই হতবাক দৃষ্টিতে দেখল, সব খালি, সব শূন্য। বাড়ি-ঘর-দোর সব খাঁখাঁ করছে। বেশ কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। খাদ্যশস্য নষ্ট করে দিয়েছে। চারদিকে শ্মশানের বিভীষিকা। এতটা পথ বেয়ে, এতখানি ভিতরে ঢুকে নেপোলিয়নের বাহিনী না পেল আশ্রয়, না উপযুক্ত খাদ্য।

আসলে জার আলেকজান্ডার শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যে-নীতিটা নিয়েছিল সেটা হল পোড়ামাটি নীতি। শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসছে, আসুক। আমরা তাদের বাধা দেব না। বরঞ্চ পালিয়ে যাব, আর তারা আমাদের পিছু ধাওয়া করে আরো গভীরে ঢুকে যাবে। তারপর বুঝবে কত বড় ফাঁদে পা দিয়েছে ...

প্রায় সাত সপ্তাহ ধরে রাশিয়ার ভেতরে, আরো ভেতরে ঢুকে গেল নেপোলিয়নের বিশাল বাহিনী। যে জনপদ, যে শহর আর গ্রামের ভেতর দিয়ে গেল, সব জয় করল। জয় করল বিনা বাধায়। কিন্তু এ কেমন জয়! সে অঞ্চলে লোক নেই, বসতি নেই, চারদিকে শুধু প্রাণহীন নীরবতা, দগ্ধ শস্যক্ষেতের নীরব ব্যঙ্গ, শূন্য বাড়ির ভূতুড়ে চেহারা। মাইলের পর মাইল এই রাজ্য নিয়ে কোন্ গৌরবে নিজেকে ধন্য মনে করবে নেপোলিয়ন। এমন শ্মশানরাজ্য, যার আকাশে কিনা একটা পাখি পর্যন্ত ওড়ে না...

গভীর চিন্তায় পড়ল নেপোলিয়ন। ভেবে দেখল, এরপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো আর তিনটা জায়গা আছে রাশিয়ায়। একটা সেন্ট পিটার্সবার্গ, একটা কীভ, আরেকটা মস্কো। তিনটার মধ্যে কোন্টা হবে নেপোলিয়নের লক্ষ্য? আরো কিছুটা এদিক-ওদিক করে শেষে ঠিক হল—মস্কো। মস্কো চল। রাশিয়ার কেন্দ্রবিন্দু—রাশিয়ার রাজধানী। মস্কোর পা

আঘাত দিয়ে রাশিয়ানদের বোঝাতে হবে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের কব্জির জোর কতখানি। তার বন্ধুত্ব উপেক্ষা করবার ফল কত তিক্ত, কত ভয়ানক।

নেপোলিয়ন মস্কো অভিমুখে আসছে শুনে রুখে দাঁড়াবার জন্য তৈরি হল জার আলেকজান্ডার। মস্কো রক্ষা করতেই হবে। মস্কো থেকে বাহাত্তর মাইল পশ্চিমে, বোরোডিনো গ্রামে সৈন্য সাজাল রুশ সেনাপতি কুটুজভ।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। নেপোলিয়ন তার অভিযান নিয়ে পৌঁছে গেল বোরোডিনো গ্রামের কাছে ঢালু জমিতে। কাছেই শত্রুসৈন্যের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হল সে। বুঝতে পারল, এবার আর পালিয়ে যাবে না তারা। এবার পুরোপুরি যুদ্ধ। আর এ যুদ্ধই নেপোলিয়নের কাম্য। নইলে যুদ্ধের নামে এই লুকোচুরি খেলায় শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা যায় না।

সেনাপতি কুটুজভ ছাড়া সেনাপতি বার্কলেও এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত ছিল। প্রস্তুত ছিল আরো কয়েকজন সেনাপতি। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় আড়াই মাইল জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। বোরোডিনো থেকে উটিটজা হয়ে যে রাস্তাটা মস্কো চলে গেছে, সেই রাস্তার ওপর নির্দিষ্ট হল এই যুদ্ধক্ষেত্র।

রুশ সেনার সংখ্যা ছিল সবসুদ্ধ এক লক্ষ কুড়ি হাজার। কামানের সংখ্যা ছ শ পঞ্চাশ। অন্যদিকে ফরাসিদের সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার। কামান পাঁচ শ সাতাশি।

নেপোলিয়ন বোরোডিনো আক্রমণ করার ভার দিয়েছিল জোসেফাইনের প্রথম ছেলে ইউজিনের ওপর। তার দক্ষতার ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল নেপোলিয়নের। আরো যারা সেনাপতি রয়েছে তাদের শরীরেও রয়েছে বহু যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। ৭ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটায় ফরাসি পক্ষ থেকে ছুটে গেল প্রথম গোলা। সাথে সাথে ওপাশ থেকে জবাব এল কামানের মুখে। শুরু হল যুদ্ধ। রুশ সেনাবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় একের পর এক আহত হতে লাগল ফরাসি সেনাপতিরা। অবাক হয়ে দেখল নেপোলিয়ন, কী আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে দুর্ধর্ষ কোজাক অশ্বারোহী বাহিনী! কী তীব্র ওদের যুদ্ধনীতি! প্রাণ থাকতে বুঝি হঠবে না ওরা।

যুদ্ধরত অবস্থায় মারা গেল সেনাপতি কুটুজভ। মারা গেল আরো অনেকে। মাটি দিয়ে 'থ্রি অ্যারোজ' নামে পরপর তিনটা বাধার প্রাচীর তৈরি করেছিল রুশরা। এখানকার সৈন্যরা ছিল সবচাইতে দুর্ধর্ষ। কিন্তু হলে কী হবে। জীবনকে বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেনাপতি মুরাট, ইউজিন আর নে। বেশ খানিকটা ঘায়েল হল রুশবাহিনী। তবে চূড়ান্ত ফলাফল এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। সেনাপতি নে আরো সাহায্য পাঠাল তার ক্লান্ত সৈনিকদের কাছে। এই যুদ্ধের ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী সাফল্য। দুপুরের দিকে সেনাপতি ফ্রাঁসোয়ার অধিনায়কত্বে আরেকটা দুর্ভেদ্য বাধা রিভাউট আক্রমণ করল ফরাসিরা। সেখানে সাজিয়ে রাখা সাতাশটা কামানের মুখ থেকে অবিরাম আগুন ঝরতে লাগল নেপোলিয়ন-বাহিনীর ওপর। দু পক্ষই মরিয়া হয়ে উঠল। বাড়তে লাগল মৃতের সংখ্যা। পথ, পরিখা সবকিছু ভরে উঠল মৃতদেহের স্তূপে।

শেষ পর্যন্ত দু পক্ষই এমন মুখোমুখি হয়ে পড়ল যে, কামানের গোলা ছোড়ার কোনো সুযোগ রইল না। এবার শুরু হল হাতাহাতি যুদ্ধ। বেয়নেট, বর্শা ইত্যাদি হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করতে লাগল। সেনাপতি ফ্রাঁসোয়া সাংঘাতিকভাবে আহত হল। ডাক্তার ল্যারীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দু শর মতো আহত সৈন্যের হাতপা কেটে ফেলে দিতে হল—পাছে গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়। নেপোলিয়ন শুধু দেখে যাচ্ছে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা। মস্কো অভিযানকে সফল করতেই হবে।

সন্ধের সময় একসঙ্গে রিভাউট আক্রমণ করল ইউজিন, নে ও মুরাট। এই চাপ সহ্য করতে পারল না রিভাউট। পতন হল। পালাতে শুরু করল রুশ বাহিনী। এবার নিশ্চিন্ত হল নেপোলিয়ন। মস্কো যাবার পথ এবার পরিষ্কার।

বোরোডিনো জয়ের হিসেব খতিয়ে দেখা গেল, পঁয়তাল্লিশ হাজার রুশ সেনা মারা গেছে। বন্দি হয়েছে দুই হাজার। ফরাসি পক্ষের ক্ষতি তেত্রিশ হাজার। এই জয় আনন্দের জয় নয়, ক্ষতির জয়। উল্লসিত হতে পারল না নেপোলিয়ন। উল্লাস করবে কাদের নিয়ে! সেনাপতিদের তেতাল্লিশ জন মারা গেছে এই যুদ্ধে, মারা গেছে বহু সামরিক কর্মচারী। এই ক্ষতি কোনো উল্লাস বয়ে আনে না, আনতে পারে না।

অবশেষে এল সেই শুভদিন। ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮১২। মস্কো প্রবেশ করে চারদিকে তাকাল নেপোলিয়ন। এত দিন ধরে শুধু পোড়ামাটি পার হয়েছে। দেখেছে শুধু ধ্বংস আর শূন্যতা। এবার দেখল মস্কোর রাজকীয় চেহারা। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বিশাল সব রাজপ্রাসাদ আর কত চার্চ! এসবে শুধু স্থাপত্যবিদ্যার পরিচয় নেই, তার সঙ্গে রয়েছে অপূর্ব শিল্পসম্ভার। দেখল আর মুগ্ধ হল সৌন্দর্যপিয়াসী নেপোলিয়ন।

রাজপ্রাসাদে ঢুকে সুন্দর একটা ছবি বের করল সে। হাতে আঁকা নাদুস-নুদুস একটা বাচ্চার ছবি। সবুজ ভেলভেটের কুশনের ওপর শুয়ে রয়েছে। হাতে ছোট্ট একটা খেলনা—রাজদণ্ড। ফায়ার প্লেসের ম্যান্টেল পিসের ওপর সবার দর্শনীয় করে রাখল ছবিটা। আজকের শিশু। দিনে দিনে বড় হবে। প্রথম নেপোলিয়নের পর দ্বিতীয় নেপোলিয়ন। বাপের মনে কত আশা, কত স্বপ্ন! ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উচ্ছ্বসিতভাবে বলল সে, 'দেখ, আমার ছেলের ছবি দেখ। আমার ছেলে কিং অব রোম। রোমের ভাবী সম্রাট। এই ছেলের বয়স যদি বছর পনেরও হত, তাহলে আজ এই মুহূর্তে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াত।'

নেপোলিয়ন মস্কোয় প্রবেশ করল ঠিকই, কিন্তু মস্কো জয় করল কি? কই, এদেশীয় এক জন লোকও তো এগিয়ে এল না বিজয়ী সম্রাটকে নতশিরে অভিবাদন জানাতে। বিজয়ী দলকে অভ্যর্থনা জানাতে রাস্তার দুপাশে ভিড় দেখা গেল না। এ জয়ে শুধু অহঙ্কার আছে, উল্লাস নেই। প্রাপ্তি আছে, সন্তোষ নেই। খাওয়াদাওয়া হল, খানিকটা হুল্লোড় হল, বিশ্রামের ব্যবস্থাও হল, তবু একটা বুকচাপা চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে রইল সবাই। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। থমথমে তো লাগবেই। এত বড় একটা শহরে লোকজন কোথায়? গোটা মস্কোই যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।

মস্কোবাসীরা এ সময় সত্যিই মস্কোয় ছিল না। বোরোডিনোর যুদ্ধের পর গভর্নর রস্টোপচিনের নির্দেশে সবাই মস্কো থেকে চলে গেছে। আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র পনের হাজার থেকে গিয়েছিল সেখানে। মানে ইচ্ছে করেই ফেলে যাওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে কিছু ছিল বাইরের লোক। বাদবাকি ছিল জেলখাটা চোর-ছ্যাঁচোড় আর কোথাও আশ্রয় না পাওয়া ভিখিরির দল।

বিষাদে ভরে রইল নেপোলিয়নের মন। দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা দিন। ক্রেমলিন প্রাসাদে প্রবেশ করে প্রথম দিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে, আলেকজান্ডারের কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠাবে। আর যুদ্ধ নয়, আর ধ্বংস নয়। আলেকজান্ডার তখন সেন্ট পিটার্সবার্গে। নেপোলিয়ন সেখানে লোক পাঠাল। প্রস্তাব দিল, আলেকজান্ডারের বন্ধুত্ব কামনা করছে সে। যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি চাইছে।

দু সপ্তাহ লাগবে ওখান থেকে জবাব আসতে। সাগ্রহে অপেক্ষায় রইল নেপোলিয়ন। কিন্তু অপেক্ষা করাই সার হল, জবাব এল না।

এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল নেপোলিয়ন। অস্থির হয়ে উঠল। জারের এই নীরব অপমানের জবাবে তাকে তো কিছু একটা করতে হবে। এখানে বসে আশায় আশায় দিন গুনলে তো আর চলবে না। নেপোলিয়ন প্রথম স্থির করল সেন্ট পিটার্সবার্গে যাবে। তারপর ঠিক করল স্মোলেনেস্কের ভেতর দিয়ে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ড যাবে। আগামী শীতটা ওখানেই কাটাবে। এইসব তানানানা করতে গিয়ে বেশ কটা দিন দেরি হয়ে গেল। ১৫ অক্টোবর তিন ইঞ্চি বরফপাত হল মস্কো নগরীতে। প্রকৃতির এই ক্রূর ইঙ্গিত সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়নের গ্রহণ করা উচিত ছিল। অর্থাৎ আর দেরি নয়, এবার মস্কো ছাড়। নইলে বরফের কামড়ে মরতে হবে। ১৮ অক্টোবর হঠাৎ একটা রুশ বাহিনী আচমকা আক্রমণ করে বসল মুরাটের সেনাবাহিনীকে। বহু যুদ্ধে বিজয়ী মুরাট থতমত খেয়ে গেল এই আচমকা আক্রমণে। পরাজিত হল। আড়াই হাজার ফরাসি সৈন্য মারা গেল। নেপোলিয়ন এবার স্থির সিদ্ধান্তে এল। 'আর এখানে নয়, এবার তাঁবু গোটাতে হবে। কালকেই মস্কো ছেড়ে রওনা হব, তৈরি হও সবাই।'

পরদিন। বেলা দুটোর সময় নেপোলিয়নের গ্র্যান্ড আর্মির প্রথম ব্যাচ মস্কো ছাড়ল। আর সেই দলকে অনুসরণ করে চলল বাদবাকি সবাই। এদের খাদ্য ছিল মাত্র কুড়ি দিনের। ঘোড়ার ছিল মাত্র সাত দিনের।

আহতদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করল নেপোলিয়ন। তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে অনেক যত্নে, অনেক সতর্কতার সঙ্গে। ইতিহাসে নেপোলিয়নের জীবনীকে কেবল বারুদের গন্ধ দিয়ে বিষাক্ত করা হয়েছে। তার এই মহত্ত্ব, আহত অসহায়দের জন্য এই মানবতাবোধ সেই বিষের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। নেপোলিয়ন যোদ্ধা না হয়ে যদি শাসক হয়েই নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমারেখা টেনে রাখত, তাহলে বলা যায় না তার ইতিহাস কোন গৌরবের কাহিনী হয়ে লেখা থাকত।

কেটে গেল পাঁচটা দিন। দুদিনের দিন ভোরবেলা হঠাৎ যেন দুঃস্বপ্ন দেখল নেপোলিয়ন। সামনে পথ আটকানো। বন্ধ করে দিয়েছে রুশ সেনারা। অথচ ওটাই ছিল ফিরে যাবার প্রধান পথ।

বাধ্য হয়েই পথ বদল করতে হল নেপোলিয়নকে। যে পথ ধরে মস্কো এসেছিল সেই পথ ধরেই ফিরতে বাধ্য করা হল তাকে।

পথের সেই পুরোনো দৃশ্য। চারদিকে পুড়ে কালো হয়ে রয়েছে। কোথাও কণামাত্র খাদ্য রুশীয়রা রেখে যায় নি। এই আঘাত কামানের গোলার চাইতেও অনেক অনেক বেশি মারাত্মক। এর ওপর আবার শুরু হল রাশিয়ার শীত–সেনাপতির খেলা। ভুল করেছিল নেপোলিয়ন। আলেকজান্ডারের মিথ্যে আশায় সময় নষ্ট করা ঠিক হয় নি। আর ভুল করেছিল শীতকালে রাশিয়ার প্রকৃতি কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে সেটা বুঝতে না পেরে।

২৯ অক্টোবর থেকে শুরু হল বরফ পড়া। তার পরদিন থেকে তুষার ঝড়। রুশীয়রা নিশ্চিন্ত, জার পরিবার খুশি। তাদের দেশকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে বাঁচাতে শীত–সেনাপতির তুলনা নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সাদা বরফের চাদর মোড়া। চারপাশে সাদা বরফের নিরেট দেয়াল। বরফের গাছ, বরফের বাড়ি—সবকিছু বরফে ঢাকা। সবচাইতে দুঃসহ হল ঘোড়াগুলোর অবস্থা। ওদের জন্য মাত্র এক সপ্তাহের খাদ্য নেয়া হয়েছিল। ভাবা

গিয়েছিল ফেরার পথে পাওয়া যাবে। মিলবে নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু সে পথ যে রুশ বাহিনী আটকে দেবে তা তো আর ভাবা যায় নি। পেটের জ্বালায় পাইন গাছের বাকল চিবিয়ে খেতে লাগল বোবা প্রাণীগুলো। মরে গেল অনেক।

ওদিকে বরফ পড়া পিচ্ছিল পথে বন্দুক–কামান নিয়ে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল সেনাবাহিনীর। শেষ পর্যন্ত অপারগ হয়ে বন্দুক–কামান ফেলে যেতে লাগল সৈনিকরা। শুধু মানুষ এগিয়ে গেল। সবচেয়ে কাছের গন্তব্যস্থল স্মোলেনেস্ক দু শ মাইল দূরে। সেখানে গিয়ে তবে আশ্রয়, তবে খাদ্য। এখন শুধু এগিয়ে চল। টেনে হোক, হিঁচড়ে হোক, শরীরটাকে চালু রাখ। এখনো দু শ মাইল...

দেখতে দেখতে এসে গেল নভেম্বর মাস। ক্রমেই সঙ্গিন থেকে সঙ্গিনতর হয়ে উঠল সৈনিকদের অবস্থা। শুধু একটু খাদ্য আর আশ্রয়ের প্রয়োজন। আর সবকিছু তারা ভুলে গেছে। যেই রাত্রির অন্ধকার নেমে আসত, তার সঙ্গে নেমে আসত মৃত্যুর শীতলতা। তখন একটু আশ্রয়ের জন্য কী না করত মানুষগুলো! মৃত ঘোড়ার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে সেখানে নিজেকে ঢুকিয়ে শরীর গরম রাখার চেষ্টা করত। সঙ্গীসাথীদের মধ্যে যখনই কেউ মারা যেত, সঙ্গে সঙ্গে তার জুতো খুলে নিজের ব্যাগে পুরে ফেলত। পাগলের মতো হাতড়ে দেখত তার হ্যাভারস্যাকে কোনো খাবার আছে কি না, নেবার মতো আর কী আছে। সেইসঙ্গে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দেখত আর কেউ মর–মর বা মরেছে কি না। সঙ্গীসাথীদের মৃত্যু যে এত মধুর, আগে জানা যায় নি তো!

মানুষ তখন মানুষ নেই। তখন আর তার মধ্যে কোনো অনুভূতি নেই, নেই কোনো মানবিক চেতনা।

অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্মোলেনেস্কে পৌঁছল নেপোলিয়ন। ভেবেছিল ফরাসি বাহিনীর অবশিষ্ট সৈনিকরা একটু খেয়ে বাঁচবে, আশ্রয় পেয়ে একটু আরামে নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু বৃথা আশা। সেখানে রুশীয় সৈন্যরা আবার আক্রমণ চালাল তার ওপর। উদ্দেশ্য, নেপোলিয়ন যেন সামনে এগিয়ে বারেসিনো নদী পার না হতে পারে।

স্মোলেনেস্কে পাঁচ দিনের বেশি থাকতে পারল না নেপোলিয়ন। বিরাট বাধা বারেসিনো নদী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার হতে হবে, নইলে ধ্বংস অনিবার্য। ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হল আবার একঘেয়ে পথ চলা। ২২ নভেম্বর একটা দুঃসংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গেল নেপোলিয়ন। শত্রুসৈন্যরা নাকি বারেসিনো সেতু পুড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ নেপোলিয়ন আর তার গ্র্যান্ড আর্মিকে একেবারে আটকে ফেলা হল। সবার মনে শুধু একটাই আশঙ্কা, নেপোলিয়ন এবার নিশ্চয়ই রুশদের হাতে বন্দি হবে। কারণ ইতোমধ্যে বেশ ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে, নেপোলিয়ন কে, দেখতে কেমন... বেঁটে, ফ্যাকাশে, ভারি মোটা ঘাড়, কালো চুল... ।

নেপোলিয়নের মনেও ওই একই আশঙ্কা। তবে যতই শঙ্কিত হোক, সে কিন্তু কিছুতেই আশা ছাড়ল না। সব জেনেশুনে বারেসিনো নদীর দিকেই এগিয়ে গেল। পৌঁছে দেখল, সত্যিই শত্রুপক্ষ খুব ভালো করেই তাদের কর্তব্য পালন করেছে। অমন যে তিন শ গজ চওড়া বারেসিনো সেতু, তাকে কিনা তিন–তিনটা জায়গায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। এই ভাঙা সেতু তো সংস্কার করাও যাবে না। ঘন ঘন গোলাবর্ষণ করছে শত্রুপক্ষ। নেপোলিয়নের হাতে তখন ঊনপঞ্চাশ হাজার সৈন্য আর আড়াই শ কামান। আর রুশদের সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। অর্থাৎ ফরাসিদের তিন গুণ বেশি।

নেপোলিয়ন যখন ভেবেচিন্তে কূলকিনারা পাচ্ছে না, ঠিক সেই সময় কর্বিনো নামে এক সামরিক কর্মচারী খবর দিল, ন মাইল দূরে, স্টুডিয়েঙ্কা নামে একটা গ্রামের কাছে বারেসিনো নদী পেরোবার একটা দারুণ সুযোগ রয়েছে। সেখানে নাকি নদীটা মাত্র এক শ গজ চওড়া এবং ছ ফুটের বেশি গভীর নয়।

এমন জায়গার সন্ধান পেয়ে লাফিয়ে উঠল নেপোলিয়ন। পরদিন সদলবলে গিয়ে পৌঁছল সেখানে। পৌঁছেই সেতু তৈরির কাজে লেগে গেল। পাশাপাশি দুটো সেতু হবে। একটা সৈন্যদের পায়ে হেঁটে যাবার জন্য। আরেকটা থাকবে কামান, গাড়ি ইত্যাদি ভারি মালপত্তর নেবার জন্য। অবিরাম খাটতে লাগল এতদিনের না-খাওয়া, না-বিশ্রাম করা লোকগুলো। সমবেদনায়, কৃতজ্ঞতায় ভারি হয়ে উঠল নেপোলিয়নের বুক। নিজে ওদের হাতে মদের পাত্র তুলে দিল। অসীম শ্রান্তির একটুখানি অন্তত দূর হোক।

বেলা চারটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল সেতু দুটো। প্রথমে এগার হাজার সৈন্য গেল ওপারে। তারপর গেল অনেক অশ্বারোহী, ভারি কামান ও গাড়ি।

হঠাৎ এদিকে চোখ পড়ল একজন রুশ সেনাপতির। বুঝতে পারল, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কী চতুরতার সাথে নদী পেরোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে নেপোলিয়ন। সাথে সাথে রুশীয়দের হাতে আক্রান্ত হল ফরাসি বাহিনী। সেনাপতি নে তিরিশ হাজার সেনা নিয়ে ঠেকাতে লাগল এই আক্রমণ। আর ওদিকে নেপোলিয়ন তার সেনাবাহিনী পাঠাতে লাগল ওপারে। তারপর নিজে গেল। তীব্র থেকে তীব্রতর হল রুশ আক্রমণ। শেষ আট হাজারের মতো লোক আর পালাতে পারল না। এপারে রয়ে গেল। বারেসিনো নদী পার হবার ঘটনা ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়।

ঠিক এই সময় প্যারিসে মালাট নামে এক লোক রটিয়ে বেড়াচ্ছিল, নেপোলিয়ন নাকি মস্কোতে মারা গেছে। রাজনীতিতে এই ধরনের রটনা বড় ক্ষতিকর। এতে অনেক অঘটন ঘটে। যাই হোক, কয়েকজন সেনাপতি আর দূত কলিনকোর্টকে নিয়ে স্লেজে করে এগিয়ে চলল নেপোলিয়ন। গন্তব্যস্থল নীমেন নদী পেরিয়ে গ্র্যান্ড ডাচি অব ওয়ারশ। যাত্রাপথে বার বার শুধু একটা কথাই বলল, 'ওদের শীতই যথেষ্ট। আমরা হেরেছি শীতের কাছে। আমাদের তাড়িয়েছে আবহাওয়া...' মন্তব্য যথার্থ?

সুন্দর এক সকালে ডাচি অব ওয়ারশতে পৌঁছল নেপোলিয়ন। বড়ই ঝকমকে সকাল। খুশিতে ভরে উঠল মন। কয়েক দিন স্লেজে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবার পর এবার দু পা টানটান করে হেঁটে বেড়াল।

যেদিন পৌঁছল, সেদিনই রাতে ওয়ারশ ত্যাগ করল নেপোলিয়ন। ১১ ডিসেম্বর পৌঁছল পোজেন বলে এক শহরে। সেখান থেকেই যোগাযোগ হল ফ্রান্সের সাথে। একটা চিঠি পাওয়া গেল মারি লুইজার। কত দিন—কত দিন পরে স্ত্রীর চিঠি, আর দেশের খবর! ছেলের নাকি দাঁত উঠেছে।

প্রাশিয়ায় পৌঁছে মনটা খারাপ হয়ে গেল। রুশ অভিযানের ব্যর্থতা জড়িয়ে নানারকম রসালো খবর বেরোচ্ছে, কার্টুন আঁকা হচ্ছে। একটা কার্টুনে দেখা গেল, বরফের পথ বেয়ে সার বেঁধে ফরাসি সৈন্যরা ফিরে আসছে। ভূতুড়ে চেহারা, হাতে অস্ত্র নেই, ক্লান্ত, শ্রান্ত। তাদের মাথার ওপর দুপাশে পাখা মেলে রয়েছে নেপোলিয়নের রাজকীয় প্রতীক। তবে ঈগল নয়—তার বদলে অশুভদর্শন শকুনি...

অবশেষে রাইন নদী পেরিয়ে দেশের মাটিতে পা রাখল নেপোলিয়ন। রুশ অভিযানের

বিশদ বিবরণ দিয়ে একটা বুলেটিন বের করল। বিবরণে অভিযানের ব্যর্থতা গোপন করল না, তবে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে রাশিয়ার শীতকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করল সে।

পথের আরো কিছু ছোটখাটো বাধা কাটিয়ে অবশেষে কলিনকোর্টকে নিয়ে প্যারিসের বিজয়-তোরণের কাছে এল নেপোলিয়ন। তারপর সোজা চলে গেল ট্যুইলারির প্রাসাদে।

দেশে ফিরে কাজে ডুবে গেল নেপোলিয়ন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পনের ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম। কে বলবে এই লোকটা সবেমাত্র দুর্জয় প্রকৃতির ঝাপটা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এসেছে! নতুন সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে হবে, কোথায় ভেনিসে নৌবহর বাড়াতে হবে, কোথায় টাওয়ার তৈরি করে স্পেন-ফ্রান্স সীমান্ত রক্ষার দিকে আরো নজর রাখতে হবে, সব—সবকিছুর দিকে নেপোলিয়ন যেন শতচক্ষু হয়ে নজর দিতে শুরু করল। যে ফরাসিরা ব্যর্থ রুশ অভিযানের খবর পড়ে মুষড়ে পড়েছিল, সম্রাটের ওপর আস্থা হারাচ্ছিল, তারা এই কর্মতৎপরতায় নতুন জীবন পেল, শক্তি পেল।

ওদিকে রাশিয়ায় তখন এক বিরাট নাটকের মহড়া চলছিল। রাশিয়ায় এসে আলেকজান্ডারের কাছে নেপোলিয়ন পরাজিত হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে গেছে—এসব কথা জোরেশোরে প্রচার হতে লাগল। এখন আলেকজান্ডারই একমাত্র পুরুষ যে ইউরোপকে নেপোলিয়নী ত্রাস থেকে উদ্ধার করতে পারে। সে-ই হবে ইউরোপের মুক্তিদাতা।

নীমেন নদী পেরিয়ে গ্র্যান্ড ডাচি অব ওয়ারশতে পৌঁছল আলেকজান্ডার। প্রচারে অদ্ভুত কাজ হল। দেখা গেল, নেপোলিয়নের অত সাধের গ্র্যান্ড আর্মির বিরাট একটা দল বেরিয়ে এসে রাশিয়ার দলে যোগ দিয়েছে। আরো সাংঘাতিক হল, তারা যখন রাশিয়ার রাজা জারের সাথে হাত মিলিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তারিখটা ছিল ১৭ মার্চ, ১৮১৩।

'যাক, শত্রুতা যত স্পষ্ট হয়, ততই ভালো।' খুব নির্ভয়ে মন্তব্য করল নেপোলিয়ন। নির্ভয়ের কারণ ছিল। কারণ ইতোমধ্যে তার নতুন সৈন্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজারে। সবচাইতে বড় ভরসা, অস্ট্রিয়া তো সঙ্গে আছে। শ্বশুর কি কখনো জামাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারে?

নেপোলিয়নের ছেলে এখন দেড় বছরের দামাল হয়ে উঠেছে। দেখায় যেন তিন-চার বছরের। থপথপ করে টলমল পা ফেলে গদি-মোড়া মেঝেতে। আদরে আদরে ছেলেকে অস্থির করে তোলে নেপোলিয়ন। মারি লুইজা তার বাবা ফ্রান্সিসের কাছে চিঠি লিখল। একবার নয়, শতবার—'বাবা, তোমার নাতি হাঁটতে শিখেছে। বড় দুষ্টু হয়েছে। বাবা, তুমি দেখলে কত খুশিই না হতে...!' আরো চিঠি গেল। '—বাবা, তোমার ওপর ফরাসি সম্রাটের কী শ্রদ্ধা, কী ভালবাসা। এমন একটা দিন যায় না যেদিন তিনি তোমাকে শ্রদ্ধা জানান না। তোমার আত্মীয়-মৈত্রীতে তিনি কত নিশ্চিন্ত...!'

নববর্ষে শ্বশুরকে দামি এক ডিনার-সেট পাঠাল নেপোলিয়ন। মারি লুইজার সৎ মা, অস্ট্রিয়ার রানীকে প্রায়ই পাঠাতে লাগল আধুনিকতম ফ্যাশনের পোশাক।

কিছুদিন আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল নেপোলিয়ন। এবার এগিয়ে গেল রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর দিকে। পরপর দুটো যুদ্ধে জয়লাভ করায় আবার চমকে উঠল গোটা ইউরোপ। ঘোড়ার পিঠে চড়ে, হাতে খোলা তরবারি নিয়ে প্রাশিয়ার সেনাপতি ব্লুকারের মোকাবিলা করল সে।

এরই মধ্যে বড় দুঃখের সাথে লক্ষ করল, অস্ট্রিয়া তাকে কোনোদিন কিছুমাত্র দিয়ে সাহায্য করল না, কোনো সাড়া পর্যন্ত করল না। নেপোলিয়ন যখন শ্বশুরের এই ব্যবহারের

কারণ জানতে চাইল, ফ্রান্সিস জবাব দিল, মস্কো থেকে ফেরার পথেই তো অস্ট্রিয়ার সব সৈন্য সাবাড় হয়ে গেছে। আবার নতুন করে সৈন্য জোগাড়ে সময় লাগবে... ।

এ কেমন কথা! ভুরু কুঁচকে গেল নেপোলিয়নের। এরপর আরো জোর ধাক্কা খেল যখন ফ্রান্সিস জানাল যে সে নেপোলিয়ন আর তার শত্রুরাজ্যের মধ্যে একটা মধ্যস্থতা করবার চেষ্টা করছে।

ফ্রান্সিসের হাভভাব মোটেই ভালো ঠেকল না নেপোলিয়নের। সবকিছু খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে চাইল সে। কিন্তু কোনো আগ্রহ দেখা গেল না ফ্রান্সিসের মধ্যে। কদিন পর ফ্রান্সিস তার বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী, ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার কাউন্ট মেটারনিককে নির্দেশ দিল নেপোলিয়নের সাথে কথাবার্তা চালাবার জন্য।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে খুশিতে লাফিয়ে উঠল মেটারনিক। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'নেপোলিয়ন, এইবার তোমাকে বাগে পেয়েছি। তুমিই না একদিন রাইন নদীর পারে আমার অমন সুন্দর জামিদারিটা কেড়ে নিয়েছিলে? আমার জোহান্সবার্গের অমন টস্‌টসে আঙুরের ক্ষেতটা নিজের মুঠোয় পুরে, দু হাজার ক্ষেতচাষীকে মুক্তি দিয়ে মহত্ত্ব দেখিয়েছিলে? এবার বাছাধন, এবার আমার সুযোগ...।' বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে সজোরে এক ঘুসি লাগাল মেটারনিক।

খবর পেল নেপোলিয়ন, ফ্রান্সিস তার মুখোমুখি হবে না। মেটারনিককে এগিয়ে দিয়ে সে নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইছে। সব বুঝতে পারল নেপোলিয়ন। মারি লুইজাকে দিয়ে ঘন ঘন চিঠি লেখানো, তাকে এত দামি দামি উপহার পাঠানো, এত ভালো ব্যবহার, সব জলে গেছে। কূট রাজনীতিতে মৈত্রী, আত্মীয়তা, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি ভালো ভালো জিনিসের কোনো স্থান নেই, মূল্য নেই।

যাই হোক, পরিস্থিতি অনুযায়ী চলা ভালো। মেটারনিক প্রস্তাব দিল, প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি হোক। নেপোলিয়ন বলল, 'তথাস্তু'। তাছাড়া নিজে উদ্যোগী হয়ে শুধু প্রাশিয়া নয়, রাশিয়ার সাথেও শান্তি স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওদিকে দেখা গেল অস্ট্রিয়া দু লক্ষের মতো সৈন্য জোগাড় রাখছে—যে অস্ট্রিয়া কিনা এই সেদিনও নেপোলিয়নের দরকারের সময় বলেছিল, মস্কো থেকে ফেরার সময় সব সাবাড় হয়ে গেছে। সবই বুঝতে পারল নেপোলিয়ন। তবু একবার চেষ্টা করল যাতে অস্ট্রিয়া অন্তত নিরপেক্ষ থাকে। মেটারনিকের কাছে নেপোলিয়ন প্রস্তাব রাখল যে ইলেরিয়া নামে জায়গাটা সে অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু তার বদলে কথা দিতে হবে যে অস্ট্রিয়া কোনো পক্ষে যাবে না।

মেটারনিকের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো জবাব পাওয়া গেল না। সে নাকি ভীষণ ব্যস্ত। ফলে নেপোলিয়নের বারবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সময় হল তার। ২৬ জুন ড্রেসডেনে দেখা হল দুজনের।

'এমনিতেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, মেটারনিক', বলল নেপোলিয়ন, 'আর সময় নষ্ট না করে আমাদের মধ্যে এখনই শান্তি আর নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বোঝাপড়া হওয়া উচিত নয় কি?'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই। তবে শান্তির প্রস্তাব তো শুধু আমার আর আপনার মধ্যেই নয়। আরো অনেক দেশ আছে। তাদের কাছেও প্রস্তাব রাখতে হবে...' কেমন যেন একটু থেমে থেমে, বাঁকাভাবে কথাগুলো বলল মেটারনিক।

মেটারনিকের এই ভণ্ডামি আর সহ্য হল না নেপোলিয়নের। কিছুটা রাগতভাবে বলল, 'আমি সৈনিক, ভাঙব কিন্তু মচকাব না। অত প্যাঁচানো কথার ধার ধারি না আমি। সোজা

ভাষায় বলছি, আমি ইলেরিয়ার বদলে আপনাদের নিরপেক্ষতা কামনা করছি। আপনি রাজি আছেন কি না বলুন। নইলে আমার যা সেনাবাহিনী আছে তাই দিয়ে আমি শত্রুর মোকাবিলা করব।'

এবার মেটারনিক ঝেড়ে কাশল। অর্থাৎ দাবির ঝুড়ির মুখ খুলল। অস্ট্রিয়ার শুধু ইলেরিয়া নয়, উত্তর ইতালিও চাই। রাশিয়াকে দিতে হবে পোল্যান্ড। আর প্রাশিয়ার দাবি এল্‌ব নদীর তীরবর্তী অঞ্চল আর রাইন অঞ্চল...।'

'আর আমি বোবার মতো ইউরোপ ছেড়ে চলে যাই, তাই না?' রাগে-দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল নেপোলিয়ন, 'তাহলে এত যে শান্তির বাণী আওড়াচ্ছিলেন, তা নেহাতই আপনার ভান? আমার রাজ্য কেড়ে নিয়ে আপনি মধ্যস্থতা করতে এসেছেন? মস্ত বড় ভুল করেছেন...।'

আসলে মেটারনিক তো মধ্যস্থতা করতে আসে নি। এসেছে নেপোলিয়নকে একটু বাজিয়ে দেখতে। আর এই কথাই জানাতে যে, ভাগবাটোয়ারার দাবিটা যদি নেপোলিয়ন মেনে না নেয়, তাহলে প্রাশিয়া, রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া—এই তিনটা বৃহৎশক্তি একসঙ্গে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

আর হলও তাই। কারণ অসম্মান, অপমানের সাথে কখনোই আপস করে নি নেপোলিয়ন। নিজের সাম্রাজ্য আর সিংহাসনের মর্যাদার দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হল সে। গ্রিক ট্র্যাজেডির মতো নিয়তি যেন টেনে নিয়ে গেল তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে।

১২ আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল অস্ট্রিয়া। তার পরই খবর এল নেপোলিয়নের কাছে—শুধু অস্ট্রিয়া নয়, প্রাশিয়া, রাশিয়া, সুইডেনও সংঘবদ্ধ হয়েছে তার বিরুদ্ধে। আর এই জোটের সাথে হাত মিলিয়েছে ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড তো থাকবেই। নেপোলিয়নের ওপর তার যে বড় রাগ। প্রথম থেকেই রাগ ছিল। তারপর কন্টিনেন্টাল সিস্টেম নেপোলিয়নের দিক থেকে যতই ব্যর্থ হোক, ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থে তো জোরেই আঘাত করেছিল।

আর রাশিয়া? সে তো এখন রাগে, প্রতিশোধের স্পৃহায় টগবগ করে ফুটছে। নেপোলিয়নের রুশ অভিযান ফরাসি শক্তিকে বিধ্বস্ত করেছিল ঠিকই, কিন্তু রাশিয়ার নিজের ক্ষতি কতটা? নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে, নিজের হাতে ফসলের গোলা নষ্ট করে সে-ও কি কম বিধ্বস্ত? এর শোধ নিতে হবে না? অতএব সব সৈন্য এক হও। শেষ করে দাও ফরাসি সিংহাসনে উড়ে এসে জুড়ে বসা ওই লোকটাকে।

শুরু হল যুদ্ধ। বোহেমিয়া, সাইলেশিয়া এবং বার্লিন—এই তিন দিক থেকে ছুটে এল তিন বৃহৎশক্তির চার লক্ষ তিরিশ হাজার সৈন্য।

১৫ আগস্ট। ড্রেসডেন ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল নেপোলিয়ন। এই দিনটাতেই সে জন্মেছিল। ১৮১৩ সালের ১৫ আগস্ট চুয়াল্লিশ বছরে পা দিল নেপোলিয়ন। শুভ জন্মদিনে শুভ কাজেই যাচ্ছে বটে। নিজের মনে একটু হাসল সে।

সাইলেশিয়ার দিক থেকে বীরদর্পে এগিয়ে এল প্রাশীয় সেনাপতি ব্লুকার। নেপোলিয়ন নিজে যুদ্ধ করে ব্লুকারকে হঠিয়ে দিল অনেকখানি পেছনে। এর পরই আবার চলে গেল ড্রেসডেনে। সেখানে আটকাতে হবে বোহেমিয়া থেকে যে বিরাট সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে তাকে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি হল ২৬ ও ২৮ আগস্ট। সেই বৃষ্টির মধ্যেই এক লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে অতুলনীয় যুদ্ধের খেল্ দেখাল নেপোলিয়ন। ড্রেসডেনের যুদ্ধে জয়লাভ তার সামরিক খ্যাতির রেকর্ডে একটা বিরাট সংযোজন।

এখানকার যুদ্ধে জয়ী হল বটে, তবে চারদিক থেকে কেবল দুঃসংবাদ আসতে লাগল। তার দলেরই কেবল পরাজয়। সেনাবাহিনী নিয়ে নিজে এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন। কিন্তু গিয়ে দেখল কেউ নেই। আগেভাগেই সে–জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে শত্রুসৈন্য। একই ব্যাপার ঘটতে লাগল বারবার। আর বারবারই উত্তেজিতশক্তি আঘাত হানতে না পারার আঘাতে কুঁকড়ে গেল, মুষড়ে পড়ল। শত্রুপক্ষের এই নতুন কৌশলে ক্লান্ত হল নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী, বিরক্ত হল।

অস্থির হয়ে উঠল নেপোলিয়ন। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনার খসড়া করতে লাগল, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। অবশেষে একটা ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে চাইল সে। সেনাপতিদের ডেকে বলল, 'আমরা আপাতত বার্লিন জয় করব। তারপর সেখান থেকে পোল্যান্ড গিয়ে রাশিয়াকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। আপনারা রাজি?'

উৎসুক দৃষ্টিতে সেনাপতি নে, মুরাট, বার্থিয়ার এবং ম্যাকডোনাল্ডের দিকে তাকাল নেপোলিয়ন। পাথরের মতো শক্ত, নিশ্চল, নির্বাক দেখাল মুখগুলো। না, এই সর্বনাশা পরিকল্পনায় তাদের সায় নেই কারো। কারণ এই অভিযান ব্যর্থ হলে ধ্বংস হয়ে যাবে সবাই। এবং সেটার সম্ভাবনাই বেশি।

অস্থিরভাবে দুটো দিন কাটাল নেপোলিয়ন। তারপর ঘোষণা করল, 'ঠিক আছে, আমরা বার্লিন যাব না। ষাট মাইল পিছিয়ে লিপজিগে যাব। সেখান থেকে যুদ্ধ করব।'

১৪ অক্টোবর লিপজিগে এল নেপোলিয়ন। গ্যালোজ হিল বলে একটা জায়গায় প্রধান শিবির স্থাপন করল।

নেপোলিয়ন তার সারা জীবনের সামরিক অভিযানে বারবার প্রকৃতির বাধা পেয়েছে। এখানেও তাই হল। শান্ত হাওয়া হঠাৎ মাতাল হয়ে ঝোড়ো আবাহাওয়ার সৃষ্টি করল। নেপোলিয়নের হাতে তখন এক লক্ষ সাতান্ন হাজার সৈন্য। আর মৈত্রী–আবদ্ধ সৈন্যের সংখ্যা দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার।

১৬ অক্টোবর। কাকডাকা ভোরে দু পক্ষের কামান গর্জে উঠল। সমভূমির ওপর মুখোমুখি যুদ্ধ। এইসব যুদ্ধে যে–দলের সৈন্যসংখ্যা বেশি, সাধারণত সেই দলেরই জয়। সৈন্যসংখ্যায় নেপোলিয়ন পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া লক্ষ করল, তার নিজের কায়দাতেই শত্রুপক্ষ সৈন্য সাজিয়েছে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে শত্রুপক্ষের এই কৌশল দেখে মৃদু হাসল সে। মন্তব্য করল, 'যাক, এতদিনে ওরা তাহলে কিছু শিখেছে...।'

অসম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বীরত্ব ও কৌশলের জোর যতটুকু, তার চাইতে বড় জোর সংখ্যার। সুতরাং পারল না নেপোলিয়ন। ১৭ অক্টোবর বিকেলবেলা দূরদিগন্তে তাকিয়ে দেখল, পিঁপড়ের সারির মতো আরো, আরো সৈন্য এসে যোগ দিচ্ছে ওপক্ষে।

১৮ অক্টোবর আরো উত্তরে সরে গেল নেপোলিয়ন। নিজের হাতে যুদ্ধ করল। পারল না। তার সৈন্যরা বড় ক্লান্ত। এবার লিপজিগ থেকে চলে যাওয়াই সাব্যস্ত করল সে। এলস্টার নদী পেরোতে হবে।

সমস্ত রাত ধরে নদীর ওপর দিয়ে সেতু পার হতে লাগল ক্লান্ত সৈন্যরা। নেপোলিয়ন একজন সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, শত্রুসৈন্যরা যদি পিছু ধাওয়া করে এদিকে আসে তাহলে যেন উড়িয়ে দেয়া হয় সেতুটা। নেপোলিয়নের এই আদেশ পালন করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল হল। নিজেদের দলের সৈন্যদের শত্রুসৈন্য ভেবে কোনো চিন্তা না করেই

উড়িয়ে দেয়া হল সেতু। তখনো নদী পার হতে বাকি রয়েছে কুড়ি হাজার ফরাসি সৈন্যের। কিছু সাঁতরে পার হতে গিয়ে ডুবে মরল। বন্দি হল কয়েক হাজার। লিপজিগের এই চার দিনের যুদ্ধে মোট তেহাত্তর হাজার সৈন্য ক্ষতি হল নেপোলিয়নের। বুঝতে পারল সে, ঢালু জমিতে পা দিয়েছে। আর ওঠা নয়। এবার শুধু গড়িয়ে নেমে যাবার পালা।

লিপজিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় শুধু যুদ্ধে পরাজয় নয়, তার পৌরুষের পরাজয়। তার ভাগ্যেরও পরাজয়। যে দেশগুলো এতদিন নেপোলিয়নের একান্ত অনুগত ছিল, তারা একে একে নেপোলিয়নকে ছেড়ে যেতে লাগল। কারণ তাদের মধ্যে নাকি এবার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। জাতীয়ভাবে এখন তারা অনুপ্রাণিত। হবেই তো। ফরাসি বিপ্লবের বরপুত্র নেপোলিয়ন তার নতুন শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের চোখের সামনে যে মানবতাবোধ ও স্বাধীন সত্তার আদর্শ তুলে ধরেছিল, তার ফল তো নেপোলিয়নকে পেতেই হবে। তার এবার বিদায় নেবার পালা।

রাইন নদী পেরিয়ে নেপোলিয়ন যখন প্যারিসে এসে পৌঁছল, তখন উপলব্ধি করতে পারল, তার বলতে শুধু ফরাসি দেশটুকুই আছে। আর সবকিছু 'আমার দেশ' বলে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তার রাজ্যমালা থেকে একে একে খসে গেছে সব রাজ্য।

নেপোলিয়নের এককালীন মন্ত্রী ট্যালির‍্যান্ড বরাবরই ছিল মানুষের চামড়ার নিচে মনুষ্যেতর প্রাণী। নেপোলিয়নের নিদারুণ পরাজয়ে উল্লসিত হল ট্যালির‍্যান্ড। এক মহিলার কাছে মন্তব্য করল, 'দেখে এস, নেপোলিয়ন কেমন কুঁকড়ে-মুকড়ে বিছানায় লুকিয়ে রয়েছে।'

না, মিথ্যে কথা। নেপোলিয়ন মোটেই কুঁকড়ে-মুকড়ে লুকিয়ে ছিল না। লিপজিগের দুর্ঘটনার পর নতুন করে উদ্যম নিয়ে ইতোমধ্যে সে প্যারিসে কাউন্সিলের কাছে তিন লক্ষ সৈন্যের জন্য আবেদন জানিয়েছে।

১৮১৪ সালের পহেলা জানুয়ারি। শুভ নববর্ষে একটা দুঃসংবাদ এল নেপোলিয়নের কাছে। লিপজিগের পর প্যারিসের দিকে ধেয়ে আসছে সেনাপতি ব্লুকার। অর্থাৎ প্যারিসের পতন আসন্ন। অস্থির হয়ে উঠল নেপোলিয়ন। সৈন্য চাই। ওদিকে মারি লুইজা অসুস্থ। দুর্দান্ত কাশি। কাশির সাথে রক্ত। তবুও যেতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। ফরাসি সাম্রাজ্যের সূর্য যে পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

দু দিন পর স্যালোন্স বলে একটা জায়গায় শিবির স্থাপন করল নেপোলিয়ন। দলে মাত্র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। আর বিরোধী দলের সৈন্যসংখ্যা দুই লক্ষ কুড়ি হাজার। অর্থাৎ চার গুণ বেশি।

এবারের যুদ্ধটা হল ব্রিয়েনে। বড় ভয়ানক যুদ্ধ। তবে মুখরক্ষা করল নেপোলিয়ন। পিছু হঠতে বাধ্য হল ব্লুকারের দল। কিন্তু তাতে লাভ হল না ফরাসি পক্ষের। এরই মধ্যে পিছিয়ে যাওয়া ব্লুকারের সাথে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী যোগ দিয়ে তাকে আবার এগিয়ে নিয়ে এল। পহেলা ফেব্রুয়ারি দারুণ তুষারঝড়ের মধ্যে আট ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলল। নেপোলিয়নের ওপর প্রকৃতির কোপ তো চিরকালই আছে। তবু সে যুদ্ধ করল সব রকম কৌশল ও সর্বশক্তি দিয়ে। কিন্তু কতক্ষণ চলে এ যুদ্ধ! এক জনের বিরুদ্ধে চার জন। সুতরাং ইতিহাস যেদিকে যাবার সেদিকেই গড়াতে লাগল। সেই রাতেই পিছু হঠল নেপোলিয়ন। প্রথমে ট্রয়েজ, তারপর নোজেন্ট—সবসুদ্ধ পঞ্চাশ মাইল পথ পেছনে সরে এল ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈনিকেরা।

নেপোলিয়নের চোখের সামনে আশার আলো তো দূরে থাক, একটা কালো পরদা নেমে এল। কারণ ইতোমধ্যে খাবার টান পড়ে গেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যার মতো সর্বনাশা ইঙ্গিত আর নেই। আর এরই মধ্যে আরেকটা সর্বনাশ হল যখন খবর এল নেপোলিয়নের সামরিক জীবনের কুড়ি বছরের বিশ্বস্ত সঙ্গী, অনেক যুদ্ধের নায়ক, যাকে নেপলসের সিংহাসনে বসানো হয়েছিল—সেই সেনাপতি মুরাট নাকি নেপোলিয়নকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

নেপোলিয়ন রাগে-দুঃখে অস্থির হয়ে বলেছিল, 'এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ, আমি, আমার ফ্রান্স নেবেই...।' রাগ দেখানো ছাড়া তখন আর কীই-বা করবার ছিল তার। মীরজাফর সব দেশেই আছে।

শত্রুপক্ষ যতই এগিয়ে আসতে লাগল, ততই প্যারিসে নানারকম গুজব আর আতঙ্ক ছড়াতে লাগল। ওই আসছে কোজাক সৈন্যরা। ওরা নাকি মেয়ে দেখলেই পাশবিক অত্যাচার চালায়। লুটপাট করে। ওরা এলে কাউকে আর বেঁচে থাকতে হবে না। অতএব, পালাও, শিগ্‌গির পালাও। ভয়ে-বিভীষিকায় কাঁপতে লাগল সমস্ত প্যারিস।

এই কটা দিন যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিল নেপোলিয়ন। জীবনে যা-কিছু প্রত্যাশা, যা-কিছু আকাঙ্ক্ষা, এবার সবকিছুর অবসান। জোসেফকে ডেকে বলল, 'মারি লুইজা যক্ষ্মায় মারা যাচ্ছে। তবু ওকে বল, ও যেন ভেঙে না পড়ে। আমার ছেলেকে নিয়ে অতি অবশ্য যেন প্যারিস ছেড়ে চলে যায়।'

আর যুদ্ধ নয়, ঠিক করল নেপোলিয়ন। এবার শান্তি। শান্তির প্রস্তাব দিয়ে একটা খসড়া করে ফেলল সে। খসড়াটার মধ্যে একটা ইচ্ছা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল। সেটা হল, বিজয়ী পক্ষ যেন তাকে সম্মানজনক শর্ত দেয়। শান্তি ও সন্ধির নামে তাকে যেন অপমান, অসম্মান না করা হয়। এটা তার আন্তরিক অনুরোধ।

সেদিনের রাতটা বড় যন্ত্রণায় কেটেছিল নেপোলিয়নের। বড় নৈরাশ্যের রাত, বড় অন্ধকার রাত। একান্ত ভৃত্যকে বারবার ডেকেছিল। একবার বলল আলো জ্বালিয়ে দিতে, পরক্ষণেই বলল নেভাতে। নেপোলিয়নের মনোরাজ্যেও তখন আলো জ্বলছে আর নিভছে। যতক্ষণ পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, ততক্ষণই তো আশা। আর আশাই তো বড় দুঃখে একটু আলো।

পরদিন ভোরবেলা খবর এল, সেনাপতি ব্লুকার আর সারজেদবার্গ প্রায় পৌঁছে গেছে প্যারিসের কাছে। দু ভাবে এগোচ্ছে তারা। আবার লাফিয়ে উঠল নেপোলিয়ন। 'শান্তি নয়, আমি যুদ্ধ করব। আমার রাজ্যে শত্রু প্রবেশ করবে বিনা বাধায়? তা আমি হতে দেব না। আমার ম্যাপ কোথায়?'

আবার পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল নেপোলিয়ন। আঘাত হানল ব্লুকারকে। বড় মারাত্মক আঘাত। বারটা রুশ রেজিমেন্ট বিধ্বস্ত হয়ে গেল সেই আঘাতে। ন দিনে ছটা যুদ্ধ হল। চারটাতে জিতল। শোনা গেল, ওপাশ থেকে নাকি সন্ধির প্রস্তাব আসছে। প্রস্তাব সত্যি এল। নেপোলিয়ন শ্বশুরকে বলে পাঠাল, সন্ধি হতে পারে একটা শর্তে, সেটা হল ফ্রান্সের সাথে আল্পস্ অঞ্চল, ইরান অঞ্চল এবং বেলজিয়াম যুক্ত হবে, নইলে নয়। শ্বশুর কিন্তু ইংল্যান্ডের প্ররোচনায় বেলজিয়াম দিতে রাজি হল না। বলে পাঠাল, সন্ধি হবে, কিন্তু বেলজিয়ামের আশা ছাড়তে হবে। রাজি হল না নেপোলিয়ন। সম্মান হারানোর ভয়ে রাজি হল না। কিন্তু মারাত্মক ভুল করে ফেলল। যেখানে নিজের একটা সৈন্যের বিরুদ্ধে ওপক্ষের চারটে সৈন্য, সেখানে নেপোলিয়ন হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত নিল, কে জানে! একেই বোধহয়

বলে ভাগ্য। আর এই হয়তো নেপোলিয়নের আশাবাদী চরিত্রের ত্রুটি।

নেপোলিয়নের ভাবগতিক দেখে আবার তোড়জোড় চলল শত্রুপক্ষে। এগিয়ে এল সম্মিলিত বাহিনী।

প্যারিসে এদিকে নেপোলিয়নকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঢল নেমেছে। বিদ্রূপকারীদের বেশিরভাগই হল সেইসব প্রাগ্‌বিপ্লব যুগের ধনী অভিজাতরা, যারা বিপ্লবের সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, ক্ষমতা হাতে পেয়ে নেপোলিয়ন যাদের আদর করে দেশে ফিরিয়ে এনে সসম্মানে পুনর্বহাল করেছিল।

২৮ মার্চ। ক্রমেই এগিয়ে আসছে শত্রুপক্ষ। প্যারিস রক্ষা করবার জন্য আর মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্য এবং জাতীয় বাহিনী রয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় মারি লুইজাকে অতি অবশ্যই ছেলেকে নিয়ে প্যারিস ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে।

মায়ের সাথে গাড়িতে ওঠার সময় 'রোমের রাজা' নাকি পরদা ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুতেই যাবে না। 'বাবা আমাকে এখানে থাকতে বলেছে, আমি যাব না।' ছেলেকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তুলতে হয়েছিল। 'আমি এখানেই থাকব, আমি যাব না।' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল সেদিন নেপোলিয়নের ভবিষ্যৎ।

প্যারিসের পতন আসন্ন হল। মনোবল হারিয়ে ফেলল শহরবাসীরা। বুঝতে পারল নেপোলিয়ন, প্রজাদের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সে তখন প্যারিস থেকে এক শ তিরিশ মাইল দূরে, শত্রুবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য তাদের যোগাযোগ-পথগুলো আটকাবার চেষ্টা করতে লাগল। এই কৌশল সফল হলে নেপোলিয়নের খুব ভালো হত, কিন্তু একা আর কতটুকু করবে!

৩০ মার্চ। প্যারিস থেকে চোদ্দ মাইল দূরে একটা জায়গায় এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন। সেখানে এক ফরাসি সেনাপতি ও একদল অশ্বারোহীর সাথে দেখা হল তার। তাদের কাছে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পেল নেপোলিয়ন। শুনল, যথেষ্ট বীরত্ব দেখানো সত্ত্বেও পেরে উঠছে না ফরাসি বাহিনী। গোলাগুলির টান পড়ে যাওয়ায় একেবারেই আশা ছেড়ে দিয়েছে। সেদিনই বিকেল চারটের সময় জোসেফের নির্দেশে আলেকজাণ্ডারের সাথে সেনাপতি মারমাউন্টের সন্ধির কথাবার্তা হয়েছে। ফরাসি সৈন্যরা বন্দি হবার ভয়ে প্যারিস থেকে চলে যেতে শুরু করেছে।

এ কী করল জোসেফ! নেপোলিয়নের এত উদ্যম, এত আশার ওপর এমনভাবে ধস নেমে এল! বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার সাধের, অমনভাবে গড়ে তোলা প্যারিস আর তার নিজের প্যারিস নয়। প্যারিসের চাবি এখন জার আলেকজান্ডারের হাতে। প্যারিস শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

ভারি একটা নিশ্বাস নেপোলিয়নের বুক চেপে ধরল। সাম্রাজ্য গেল, এখন রাজধানীও গেল। নীরবে ফাউনটেন ব্লোর দিকে এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন।

পরদিন রাত দুটোর সময় নিজের প্রাসাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল সে। নিজের প্রাসাদ। বড় দুঃখের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। দোতলার প্রিয় পড়ার ঘরটাতে ঢুকল নেপোলিয়ন। মেহগনি কাঠের সারি সারি বুককেসে থরে থরে সাজানো বই। তার কতদিনের সঙ্গী এই ঘর! প্রতিটা বইতে মনের কত খোরাক, কত শান্তি! সেই ঘরে আজ শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে সে।

পরদিন বিকেলবেলা। দলবল নিয়ে প্যারিসে ঢুকল জার আলেকজান্ডার। যে কটা প্রস্তাব

রাখল তারা, তার মধ্যে নেপোলিয়নের রাজকীয় অস্তিত্ব রক্ষা সম্পর্কে একটা কথাও ছিল না। বরঞ্চ ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ বংশকে পুনঃস্থাপিত করা সম্পর্কেই বেশি জোরালো প্রস্তাব ছিল। আর নেপোলিয়ন সবিস্ময়ে লক্ষ করল, এই ব্যাপারে সবচাইতে বেশি সোচ্চার ট্যালির‍্যান্ড।

ট্যালির‍্যান্ড আগে থেকে তৈরি করা একট খসড়া দিল আলেকজান্ডারের হাতে। খসড়াটা পড়ে নিচে সই করল আলেকজান্ডার। সেটা নিয়ে এক সভা ডাকা হল সেনেটের। প্রস্তাব পাস করা হল, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সিংহাসনচ্যুত এবং লুই স্ট্যানিসলাস জেভিয়ার সিংহাসনে বসবার জন্য আমন্ত্রিত।

ঈগল মার্কা দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখল নেপোলিয়ন, 'যেহেতু মিত্রশক্তি আমাকে ইউরোপের শান্তির প্রতি অন্তরায় বলে মনে করছে, সেহেতু আমি সিংহাসন ত্যাগ করছি। তবে আমার ছেলের উত্তরাধিকারীর দাবি এবং মারি লুইজার অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয়।'

এই শর্তে আলেকজান্ডার প্রথমটায় রাজি হলেও পরে নানা পরিস্থিতির চাপে পড়ে নেপোলিয়নকে জানাল, তাকে শর্তহীনভাবে সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে, এবং বাকি জীবনটা তাকে কাটাতে হবে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসনে।

'আর আমার স্ত্রী? আমার ছেলে?' জবাবের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগল নেপোলিয়ন। এল্‌বা দ্বীপে নাই-বা রইল সম্মান আর আগের রাজকীয় মহিমা। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে একটু শান্তির বিশ্রামকুঞ্জ তো গড়ে তোলা যাবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই খবর এল, নেপোলিয়নকে একা যেতে হবে এল্‌বা দ্বীপে। মারি লুইজা ও ছেলে যাবে না সাথে। তাদের যেতে দেওয়া হবে না। নেপোলিয়নের বড় আশায় ঘা মারা হল। একজন সাধারণ মানুষ হয়ে ওই দ্বীপটাতে স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে একটু সুখের বাসা বাঁধবে, তাতেও আপত্তি!

মারি লুইজা তখন ছেলেকে নিয়ে অর্লিনস্-এ ছিল। নেপোলিয়ন খবর পাঠাল, একটা বার যেন তারা ফাউনটেন ব্লোতে আসে। এগার সপ্তাহ হল তাদের দেখা নেই। নেপোলিয়ন একবার তাদের দেখবে, কথা বলবে, পারিবারিক জীবনের স্বাদ পাবে। সবই তো ফুরিয়ে যাচ্ছে।

যাকে দিয়ে খবর পাঠানো হয়েছিল, সে ফিরে এল। মারি লুইজা অর্লিনস্-এ নেই। তাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল নেপোলিয়নের। একটা সাধারণ মানুষের সুখ থেকেও সে আজ বঞ্চিত।

১৮১৪ সালের ১৩ এপ্রিল। শেষ রাত। ঘড়িতে তখন তিনটা। মৃদু আলো জ্বলছে নেপোলিয়নের শোবার ঘরে। মারি লুইজার কাছে একটা চিঠি লিখল নেপোলিয়ন, 'মারি, তোমাকে আমি ভালবাসি, এই পৃথিবীতে তোমাকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। ইতি তোমার নেপোলিয়ন।' চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের নিচে রাখল সে। তারপর থলে থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বের করে খুলল। পাউডারের মতো খানিকটা সাদা গুঁড়ো। পানিতে মেশাল। এক ঢোকে খেয়ে ফেলল। তারপর কলিনকোর্টকে ডাকতে পাঠিয়ে শুয়ে পড়ল।

আত্মহত্যা করে সব অপমান, না-পাওয়ার লাঞ্ছনা এবং স্ত্রী-পুত্রের অদর্শনের যন্ত্রণা ভুলতে চাইল নেপোলিয়ন।

খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এল কলিনকোর্ট। শুয়ে রয়েছে নেপোলিয়ন। ইশারায় বিছানার পাশে বসতে বলল কলিনকোর্টকে। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'তোমার হাতখানা দাও, বন্ধু। আলিঙ্গন কর আমাকে...।'

কলিনকোর্ট বুঝতে পারল নেপোলিয়ন কী করেছে। এর পরই শুরু হল পাকস্থলীতে তীব্র যন্ত্রণা আর সেই সাথে হিক্কা। মনে হল, পেটের সবকিছু যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। এ যন্ত্রণা দেখা যায় না। ডাক্তারের জন্য ব্যস্ত কলিনকোর্ট। কিন্তু নিষেধ করল নেপোলিয়ন। প্রথমে শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল তার। তার পরই মনে হল যেন আগুন ধরে গেছে। পুড়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে রইল নেপোলিয়ন, যাতে বমি না হয়—পেটের বিষ বেরিয়ে গিয়ে তাকে বাঁচিয়ে না দেয়।

একটা সুযোগ পাওয়ামাত্র ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কলিনকোর্ট। ডাক্তার নিয়ে এল। এসে দেখল, সাংঘাতিক বমি করছে নেপোলিয়ন। আর বমিই সে যাত্রা নেপোলিয়নকে বাঁচিয়ে তুলল। অর্থাৎ প্রকৃতিই তার পাকস্থলী ওয়াশ করিয়ে দিয়েছিল। নইলে নেপোলিয়নের পরবর্তী দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তৈরি হবে কী করে!

১৮১৪ সালের ৪ মে। ইউরোপ থেকে আটলান্টিকের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এল্‌বা দ্বীপের পোর্টোফারাওতে এসে নোঙর করল একটা জাহাজ। দ্বীপের অধিবাসীরা অসীম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে ছিল 'আনডন্টেড' নামে ওই জাহাজটার দিকে। জাহাজে রয়েছে তাদের রাজা, 'এল্‌বা দ্বীপের সম্রাট' নেপোলিয়ন। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল তারা।

এই দ্বীপে এই প্রথম রাজা।

জাহাজ থেকে একটা নৌকা করে এল্‌বা দ্বীপের মাটিতে পা রাখল নেপোলিয়ন। প্রথম অভ্যর্থনা জানাল মেয়র ত্রাদিদি। নগরীর চাবি তুলে দিল নেপোলিয়নের হাতে।

দূর থেকে ছবির মতো লাগছিল দ্বীপটাকে। কিন্তু মাটিতে পা দিয়েই মনটা দমে গেল নেপোলিয়নের। কেমন হলদেটে, বিবর্ণ, নোংরা শহর।

পরদিন ঘোড়ায় চড়ে নেপোলিয়ন তার 'রাজ্যপাট' দেখতে বেরোল—কত বড় রাজ্য। আঠার মাইল লম্বা, আর বার মাইল চওড়া। অধিবাসীর সংখ্যা বড়জোর বার হাজার। তাদের জীবিকা প্রধানত মাছ ধরা, আঙুর ক্ষেতে এবং লোহার খনিতে কাজ করা।

হতশ্রী গরিব মানুষগুলোকে দেখে সমবেদনায় ভরে উঠল নেপোলিয়নের মন। কী দারিদ্র্য! কী অবহেলা! চঞ্চল হয়ে উঠল নেপোলিয়নের কর্মী-মন। এদের জন্য কত কী করা যায়! সুযোগ আছে, লোকগুলোর সামর্থ্য আছে—নেই শুধু পথ দেখাবার লোক, হদিস দেবার লোক।

ভাগ্যের দুয়ারে কখনো মাথা ঠুকতে চায় নি নেপোলিয়ন। তাই সব হতাশা, দুঃখ ঝেড়ে ফেলে আবার নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ইউরোপের রাজা-মহারাজারা তখন নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত। জানতেও পারল না তারা, এল্‌বা দ্বীপের সম্রাট অদমনীয় সম্রাট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বীপের নিরন্ন লোকগুলো যেন জাদুকরের স্পর্শে নতুন জীবন পেল। এল্‌বার মাটিতে তারা সোনা ফলাতে বসল। আলু, ফুলকপি, লেটুস, পেঁয়াজ, গাজরে ভরে গেল এল্‌বার যত পতিত জমি। আঙুর চাষের সাথে জুড়ে দেয়া হল জলপাইয়ের চাষ।

আদেশ জারি করল নেপোলিয়ন, সকালবেলা পাঁচটার পরে কেউ বিছানায় থাকতে পারবে না। সবাইকে খেটে খেতে হবে। আর বাজে সময় নষ্ট নয়। এবার শুধু কাজ আর কাজ। এইভাবে বাধ্যতামূলক নিদারুণ শ্রমের আহুতিতে যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠল মৃতপ্রায়, নিস্তেজ এল্‌বা দ্বীপে।

নেপোলিয়নের নিজের বাড়িটা ছিল একেবারে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। বাড়িটার নাম 'দ্য মিলস'। আসবাবপত্রগুলো সব বিবর্ণ, পুরোনো। ট্যুইলারি প্রাসাদের সম্ভ্রান্ত স্মৃতি নেপোলিয়নকে মাঝেমধ্যে বিমনা করে দিত।

সত্যি বিমনা হয়ে যেত নেপোলিয়ন। তবে ট্যুইলারির কথা ভেবে নয়, স্ত্রী–পুত্রের কথা ভেবে। সীমাহীন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবত, স্বামী স্ত্রীতে কি আর দেখা হবে না? বাপ ছেলেকে কোলে টেনে আর আদর করবে না? এরই মধ্যে আজকাল বড় বেশি মনে পড়ছে জোসেফাইনকে। জোসেফাইনের স্মৃতি তো কই, এতটুকু ম্লান হয় নি! নেপোলিয়ন আজো ভুলতে পারে নি জোসেফাইনের রুচি, তার সৌন্দর্যবোধ, তার বুদ্ধিদীপ্ত সৌজন্য।

জোসেফাইনও এই সময় বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ভীষণ কাশি আর গলার ব্যথা। ডাক্তার বলছে ডিপথেরিয়া। জোসেফাইনের কথা প্রায় বন্ধ হয়ে এল। বুঝতে পারল, সময় ফুরিয়ে এসেছে। এই নির্বাক অসুস্থ অবস্থায় নেপোলিয়নকে যেন বড় বেশি মনে পড়ছে। সযত্নে রক্ষা করে চলে মালমাইসন প্রাসাদে স্বামীর প্রতিটা স্মৃতিকে। এমনকি স্বামী যে ইতিহাসের বইটা পড়তে পড়তে যে পাতা পর্যন্ত পড়ে জোসেফাইনকে শেষ বিদায় জানিয়েছিল, সেই পাতাখোলা অবস্থায় বইটা জোসেফাইন এমনভাবে রেখে দিয়েছে যে দেখে মনে হয় নেপোলিয়ন বুঝি একটু বাইরে গেছে, এখনই ফিরে এসে আবার বই নিয়ে বসবে। বড় দেখতে ইচ্ছে করে নেপোলিয়নকে। ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, অসুস্থ, একেবারে বাকশক্তিহীনা জোসেফাইন নিজের মনেই একবার মাথা নাড়ল। আর দেখা হবে না! এ জীবনে নয়।

সত্যিই জোসেফাইনের সাথে আর দেখা হল না নেপোলিয়নের।

১৮১৪ সালের ২৯ মে মারা গেল জোসেফাইন।

জোসেফাইনের মৃত্যুর সংবাদে দু হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ বসে রইল নেপোলিয়ন। বুকের কাছে একটা ব্যথা চিনচিনিয়ে উঠল। দু দিন ঘর থেকে বেরোল না। কোনো কাজ করোল না। জোসেফাইন যতদিন নেপোলিয়নের জীবনে ছিল, ততদিন নেপোলিয়ন শুধুই উঠেছে, শুধুই জয়ধ্বনি শুনেছে। সৌভাগ্যের শীর্ষে উঠে নেপোলিয়ন রাজনীতির নির্দেশে জোসেফাইনকে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। লোকে বলে সেইদিন থেকেই নাকি নেপোলিয়নের ভাগ্যসূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে হেলে পড়েছিল। হবেও–বা। জীবনে কাকতালীয় কত ঘটনাই তো ঘটে!

নেপোলিয়ন যখন এইসব ভাবছে, ফরাসি দেশের ইতিহাসে তখন দৃশ্যান্তর ঘটেছে। সিংহাসনে তখন অষ্টাদশ লুই। শরীরে তার খাঁটি বুরবোঁ রাজরক্ত। বড় বেশি স্বাস্থ্যবান। একটু ওঠাবসা করতে গেলেই ককিয়ে ওঠে। কারণ শরীরটা বাতের দাপটে বড়ই কাবু। ব্যথাটা যখন বেশি চাগিয়ে ওঠে, তখন একটা হুইলচেয়ারে বসে চলাফেরা করে। ঘাড় ফিরিয়ে এদিক–ওদিক তাকায়। সুন্দরী, সুবেশী অভিজাত মহিলারা দরবারকক্ষ আলোকিত করে থাকে। লুই দেখে আর ঠোঁট চাটে। নিষ্ঠুর ঈশ্বর তার সব ক্ষমতাই কি কেড়ে নিয়েছে? ওই অক্ষমতার জন্যই তো সে সব সময় অমন খিটখিট করে, হাড়ি–মুখ করে বসে থাকে।

কিন্তু এদিকে ব্যস্ততার সীমা–পরিসীমা নেই। নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপে রওনা হবার পরদিন থেকেই ইউরোপের রাজনীতিবিদদের মধ্যে নানান রকম আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।

একটা ধুরন্ধর সম্মেলন হল ভিয়েনায়। ইতিহাসে এই সম্মেলনের নাম ভিয়েনা কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে ছিল রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার, অস্ট্রিয়ার মেটারনিক, ইংল্যান্ডের ক্যাসালরিগ আর ফ্রান্সের ট্যালির‍্যান্ড। ফরাসি সাম্রাজ্যকে ছেঁটে দিয়ে কে কতটা ভাগ নেবে, এই নিয়ে সবাই যখন খুব ব্যস্ত, আর তারই মধ্যে একদিন একটা নাচগানের পার্টিতে সবাই যখন হইহুল্লোড়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ চাবুকের মতো একটা খবর এসে পৌঁছল। খবর এল, এল্‌বায় নির্বাসিত সেই অদমনীয় লোকটা, যার নাম নেপোলিয়ন, সে নাকি আবার ফিরে এসে ইউরোপের মাটিতে পা দিয়েছে। ধেয়ে আসছে প্যারিসের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে ত্রাসমিশ্রিত শীতল নীরবতা নেমে এল পার্টির উল্লাসে। কেবল ট্যালির‍্যান্ড চিৎকার করে উঠল, 'আমি আগেই বলেছিলাম, ওই শয়তানটা সহজে ছাড়বে না।'

সত্যিই ফিরে এসেছিল নেপোলিয়ন। ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিল। কিছুদিন ধরে সেই অপেক্ষাতেই ছিল। নেপোলিয়নের কাছে খবর গিয়েছিল যে ফ্রান্সের প্রজারা বর্তমানে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। সাম্য-মৈত্রীর আদর্শ কোন চুলোয় মিলিয়ে গেছে। শাসনের নামে দেশময় চলছে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। নেপোলিয়ন শাসনের যে স্বাদ একবার প্রজাদের দিয়েছিল তার অভাব এখন তারা সহ্য করবে কী করে? ফ্লুরি নামে নাবিকের বেশে এক লোক এল এল্‌বায়। নেপোলিয়নের সাথে দেখা করল। দুজনের মধ্যে অনেক কিছু আলোচনা হল। আলোচনার সারাংশ হল, নেপোলিয়ন, ফিরে চল ফ্রান্সে। দেশময় অসন্তোষ। প্রজারা নাখোশ।

সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি করল না নেপোলিয়ন। প্রস্তুত হতে লাগল সে। তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করল সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল দ্রুয়ো।

নেপোলিয়ন খবর পেয়েছিল, 'ইন্‌কন্‌স্টেন্ট' নামে একটা জাহাজ ন দিনের মধ্যে এল্‌বা ছাড়ছে। দ্রুয়োকে অনুরোধ করল নেপোলিয়ন, জাহাজটাকে যেন একেবারে ইংরেজদের জাহাজের মতো রং করে দেয়। জাহাজে থাকবে ছাব্বিশটা কামান আর তিন মাসের মতো এক শ কুড়ি জন লোকের খাবার আর মদ।

ইন্‌কন্‌স্টেন্টসহ আরো ছটা জাহাজের ব্যবস্থা করা হল। নেপোলিয়ন আর তার সফরসঙ্গী সৈন্য, সেনাপতি ইত্যাদি মিলে সংখ্যায় হাজার। সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগিয়ে চলল জাহাজগুলো।

পহেলা মার্চ, ১৮১৫ সালে ইউরোপের মাটিতে পা রাখল নেপোলিয়ন। তার হাজারখানেক সঙ্গীসাথী সেদিন গোটা ইউরোপকে চ্যালেঞ্জ জানাল।

নেপোলিয়ন প্রথম যে জায়গাটায় পা রেখেছিল, তার নাম ক্যানিস। জলপাই গাছে ঘেরা। সবুজ-শ্যামল একটা জায়গা। তবে বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিল না নেপোলিয়ন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। আগে আল্পস্ পর্বত পার হওয়া, তারপর প্যারিস। ঘোড়ার গতিতে প্যারিস পৌঁছতে হবে, কেউ টের পাবার আগেই।

ক্যানিস থেকে গ্রাসি। গ্রাসি থেকে শুরু হল পাহাড়ি রাস্তা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরো ষাট মাইল এগিয়ে গেল সে। পথে পড়ল দিগ্‌নে, গেনোব্‌ল, অবশেষে সিসটারোন। পহেলা মার্চ ইতালির উপকূল ক্যানিসে নেমে মাত্র চার দিনে সিসটারোনে পৌঁছে আবার প্রমাণ করতে চাইল নেপোলিয়ন, অসম্ভব বলে কিছু নেই।

পার্বত্য গ্রাম সিসটারোনের এক সরাইখানায় বসে নেপোলিয়ন যখন একটু খেয়ে নিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় একটা তারবার্তা পৌঁছল রাজা অষ্টাদশ লুইয়ের কাছে। বার্তাটা পেয়েই কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল লুই। বাতের রোগী। কাঁপা হাতে খামটা খুলতেই কত সময় লেগে গেল। তারপর বিষয়বস্তু পড়ে তো একেবারে ঠাণ্ডা, নিথর হয়ে গেল। এ কী সাংঘাতিক খবর! খানিকক্ষণ থ' মেরে বসে থেকে সমরমন্ত্রী সাউল্টকে ডেকে পাঠাল। মন্ত্রী এলে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'এ কী খবর! নেপোলিয়ন এল্‌বা থেকে চলে এসেছে। কী হবে এখন...?'

সাউল্টের কানে আগেই খবরটা পৌঁছেছে। ফ্রান্সের সম্রাটের অবস্থা দেখে হাসি চেপে সান্ত্বনা দিল, ভয়ের কিছু নেই। লিয়োঁ শহরে নেপোলিয়নকে বাধা দেবার জন্য এখনই কামান সাজাতে বলা হচ্ছে...।'

সিসটারোন থেকে মাত্র দুই দিনে ক্যাপ্‌স বলে একটা জায়গায় পৌঁছল নেপোলিয়ন। সেখানে খবর পেল, কয়েক মাইল আগে এক বিরাট সেনাবাহিনী অপেক্ষা করছে তাকে বাধা দেবার জন্য। নেপোলিয়নকে মেরে ফেললেও কিছু দোষের হবে না। কারণ ইতোমধ্যেই সে ফরাসি দেশে আউট ল' বলে ঘোষিত হয়েছে। অতএব তার প্রতি দয়া-মায়া-বিবেচনা কিচ্ছু না।

এই মুহূর্তে কোনো সংঘর্ষ চায় না নেপোলিয়ন। বৃথা রক্তপাতে তার কোনো মোহ নেই। সে তার বাহিনীকে 'মার্সাই' বা জাতীয় সংগীত গাইতে বলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল অপেক্ষমাণ শত্রুবাহিনীর দিকে। নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। কী করছে নেপোলিয়ন! ওরা যে এখনই গুলি করে ঝাঁজরা করে দেবে লোকটাকে! চেঁচিয়ে উঠল শত্রু পক্ষের একজন, 'গুলি... গুলি কর। ওই তো নেপোলিয়ন...।'

আরো, আরো এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা পরিষ্কার দেখতে পেল সেই অতিপরিচিত লোকটাকে। সেই ধূসর বর্ণের সামরিক পোশাক-পরা ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। আরো দু পা এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন। তার পরই কোটের বোতাম খুলে বুকটা মেলে ধরল। ধীরে অকম্পিত কণ্ঠে বলল, 'যদি তোমাদের মধ্যে কেউ সম্রাটকে গুলি করতে চাও, তাহলে কর, আমি এখানে...।'

কী ছিল ওই মানুষটার কথায় আর সর্ব অবয়বে, কী ছিল মার্সাই সংগীতে—সামনের রাজকীয় বাহিনী কলরব করে উঠল। হিংসার উল্লাসে নয়, ভালবাসার উচ্ছ্বাসে। তাদের প্রিয় সম্রাট তাদের চোখের সামনে দু বাহু বাড়িয়ে তাদের আহ্বান জানাচ্ছে। আর তারা থাকতে পারে? রাজপক্ষের সৈন্যদল, যারা কিনা এসেছিল তাদের 'কর্তব্য' পালন করতে, তারাই এবার সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন'। এক মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র রূপান্তরিত হল উৎসবক্ষেত্রে—মিলনক্ষেত্রে। আর এরপর থেকেই শুরু হল দলে দলে রাজকীয় সেনাবাহিনীর এগিয়ে আসা, নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেদের লুটিয়ে দেওয়া। ঐতিহাসিক লুডউইক এই দৃশ্যে নেপোলিয়নকে যথার্থ তুলনা করেছেন হ্যামিলনের সেই বাঁশিওয়ালার সাথে।

ভালবাসার আনুগত্যে ভারি হয়ে উঠল নেপোলিয়নের বুক। রাজ্য, রাজধানী, সিংহাসন যত দূরেই থাক; মানুষগুলো এত কাছের, এত অন্তরঙ্গ, কই, আগে তো এতটা বোঝে নি! নেপোলিয়ন যতই এগিয়ে যেত লাগল, ততই বাড়তে লাগল স্বেচ্ছাসৈন্যের সংখ্যা।

লিয়োঁতে সব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নেপোলিয়নকে বাধা দেবে বলে ঠিক করেছিল

আর্তোয়া। সম্পর্কে সে অষ্টাদশ লুইয়ের ভাই। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক করবার সময় পেলে তো! নেপোলিয়ন কি বাতাসে ভর করে আসছে! নইলে এ কদিনের মধ্যে গ্রেনোব্‌লের মতো অমন সুরক্ষিত নগরটা কেমন করে নিয়ে নিল লোকটা! কী মন্ত্র পড়েছে যে অমন জাঁদরেল জাঁদরেল সেনাপতি–সেনাবাহিনী একেবারে ভেড়া বনে লুটিয়ে পড়ছে তার পায়ের নিচে? সেনাপতি ম্যাকডোনাল্ডকে নির্দেশ দিল আর্তোয়া, তার অধীনে যে তিন ডিভিশন ন্যাশনাল গার্ড আছে তাদের বলেকয়ে একটু চাঙা করে নিতে পারে কি না। তাদের একটু বোঝাতে পারে কি না যে অষ্টাদশ লুই–ই হল ফ্রান্সের বৈধ সম্রাট। আর নেপোলিয়ন নামে লোকটা হল সিংহাসন দখলকারী লুটেরা, ডাকাত...।

মাথা ঝাঁকিয়ে, নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে সৈন্যদের প্যারেড দেখল ম্যাকডোনাল্ড। তারপর গলা ছেড়ে তাদের সামনে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ল। বক্তব্য ওই একটাই, 'বুরবোঁ রাজবংশের ওপর তোমাদের আনুগত্য অটুট রাখ। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তোমরা সব রুখে দাঁড়াবে।' ম্যাকডোনাল্ড এরপর উদাত্ত কণ্ঠে বলল, 'বল সব, বুরবোঁ রাজা দীর্ঘজীবী হোন বল।'

আশ্চর্য, এতটুকু, রা নেই সৈন্যদের মুখে! সব কি বোবা হয়ে গেছে! আবার চিৎকার করে উঠল ম্যাকডোনাল্ড, 'বুরবোঁ রাজা দীর্ঘজীবী হোন বল সবাই'। সৈন্যরা যেমন ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি রইল।

এবার এগিয়ে গেল আর্তোয়া। একজন অশ্বারোহীকে ডেকে তার দলের অন্যান্য অশ্বারোহীদের রাজাকে সম্মান জানানোর নির্দেশ দিতে বলল। অশ্বারোহী তাল ঠুকে বলল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন'। সেই একই দৃশ্য। কেউ কিছু বলল না। সেই চুপ করে থাকার পালা এখনো চলছে।

বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না আর্তোয়ার। সেখানে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল সে। চাবুক পড়ল ঘোড়ার পিঠে। টগবগ করে ছুটে চলল গাড়ি প্যারিসের দিকে।

সেদিনই সন্ধ্যায় লিয়োঁ নগরে প্রবেশ করল নেপোলিয়ন। সবার প্রীতি ও সম্ভাষণে অভ্যর্থিত হল। একটাও গুলি বেরোল না তাকে রুখবার জন্য। বরং সাগ্রহ–অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আগমনী গান রচিত হল।

এরপর বার্গান্ডিতে পৌঁছল নেপোলিয়ন। সেখানে গিয়েই যার কথা মনে পড়ল, যাকে এই সময় অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে হল, সে হল সেনাপতি নে। ইতোমধ্যে সেনাপতি নে কিন্তু বুরবোঁ দলে যোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও নেপোলিয়ন তাকে তার আগমন–খবর জানাল। আর আশ্চর্য, সেনাপতি নে সাথে সাথে চলে এল নেপোলিয়নের কাছে! এ কি নিছকই ভাবালুতা? তা অবশ্যই নয়। একটা জিনিস নে ঠিকই বুঝেছিল যে, বুরবোঁ রাজবংশ ক্ষমতায় আসবার সাথে সাথে অভিজাতদের যে প্রাধান্য ঘটেছে তাতে নে যত বড় সেনাপতিই হোক না কেন, সমাজে সম্মান পাবে না, যোগ্য মর্যাদা পাবে না, বিশেষ করে যে–মর্যাদা সে নেপোলিয়নের কাছে পেয়েছে।

১৬ মার্চ, ১৮১৫। তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে, অনেকবার রিহার্সাল দিয়ে এসেম্বলি সভায় তার অভিভাষণ পাঠ করল অষ্টাদশ লুই। বক্তৃতার মূল বক্তব্য হল, নেপোলিয়ন নামে জুজু আসছে গৃহবিবাদ লাগাতে, তাকে তাড়াতে হবে, যেমন করেই হোক...। উপস্থিত সবাই রাজার প্রতি যথারীতি অটুট আনুগত্যের শপথ নিল।

অষ্টাদশ লুই অবশ্য দুদিন পরেই পালিয়ে গেল। ওসব লৌকিকতা, আনুগত্যে-ফানুগত্যে সে বিশ্বাস করে না। নইলে অমন যে জাঁদরেল সেনাপতি নে, যার ওপর কিনা এত নির্ভরতা, সে-ও সুরসুর করে চলে গেল ওই লোকটার দিকে। এর পরেও যে রাজপ্রাসাদে, রাজসিংহাসনে বসে থাকে, সে অতি বড় নির্বোধ।

১৯ মার্চ, রাত্রিবেলা। কাউকে না জানিয়ে, এমনকি মন্ত্রীদেরও খবর না দিয়ে, না বলে অষ্টাদশ লুই টুক করে খসে পড়ল ট্যুইলারি প্রাসাদ থেকে। গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা চলল বেলজিয়াম। পথে আবার একটা স্যুটকেস খোয়া গেল। সম্রাট প্রায় কেঁদেই ফেলল, 'ওই স্যুটকেসের মধ্যে আমার শোবার ঘরে ব্যবহার করা চটিজোড়া আছে। এখন কী হবে— ওরা যে আমার পায়ের ছাপ পেয়ে যাবে।'

সত্যিই ভয়ের কথা। পায়ের ছাপ পেয়ে গেলে সেই ছাপের মালিককে ধরতে কতক্ষণ?

বার্গান্ডি থেকে ছুটে আসছে নেপোলিয়ন। ২০ মার্চ তাকে পৌঁছতেই হবে প্যারিসে। সেদিন যে বড় শুভদিন। কিং অব রোমের জন্মদিন। তাই-ই হল। 'অসম্ভব' বলে যখন কথা নেই, তখন ২০ মার্চ প্যারিসে পৌঁছতেও অসুবিধা হল না। রাত তখন নটা। ট্যুইলারি প্রাসাদের সামনে গাড়িটা থামতেই চারদিক থেকে অভিনন্দনে অভিভূত হল সে। এক বিরাট জনতা ছেঁকে ধরল গাড়ি। তারা তাদের প্রিয় নেতাকে একবার স্পর্শ করবে।

গাড়ি থেকে নামল নেপোলিয়ন। দশ মাস পরে আবার পা দিল ট্যুইলারি প্রাসাদের সিঁড়িতে। হাত দুটো সামনের দিকে প্রসারিত। ধীর অচঞ্চল পদক্ষেপ। দু চোখ বন্ধ। সব মিলিয়ে শুধু একটা ভাবই ফুটে উঠেছে মুখে... এই দেখ, আবার আমি ফিরে এসেছি। তোমরা আমাকে গ্রহণ কর...।

সেই প্রিয় আবাসভূমিতে ফিরে এসেই শাসন-সংস্কারে মন দিল নেপোলিয়ন। কারণ অষ্টাদশ লুই ফরাসি দেশকে যেভাবে পেয়েছিল, সেইভাবে তাকে রক্ষা করতে পারে নি। বরং তাকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগেকার ইতিহাসে। সুতরাং নেপোলিয়ন আবার কাজ শুরু করে দিল।

তার একদিকে এই কর্মযজ্ঞ, অন্যদিকে সে দূত পাঠাল মেটারনিকের কাছে। শান্তি চাই, বন্ধুত্ব চাই। আর যুদ্ধ নয়, রক্তপাত নয়। নেপোলিয়ন নিজের হাতে চিঠি লিখে খামের মুখ বন্ধ করে দিল। পত্রবাহক গেল। ফিরে এল। চিঠিটা যেমন দিয়েছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই ফিরে এল। মেটারনিক কোনোকিছু তো বলেই নি, চিঠিটা নিতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। বুঝতে পারল নেপোলিয়ন, যে-সিংহাসন সে ফিরিয়ে নিয়েছে, সেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বারুদের স্তূপের ওপর। এখন শুধু একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছুঁইয়ে দেবার অপেক্ষা।

ঠিক আছে, নেপোলিয়ন যে-কোনো চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।

নেপোলিয়ন এবার চিঠি লিখল অস্ট্রীয়-রাজ ফ্রান্সিসকে। সে যেন অতি অবশ্যই মেয়ে মারি লুইজা এবং নাতিকে প্যারিসে পাঠিয়ে দেয়। নেপোলিয়ন চিরকালের সঙ্গী কলিনকোর্টকে পাঠাল অস্ট্রিয়ার দরবারে। রাজা ফ্রান্সিস কি তার মেয়ে আর নাতির স্বার্থ দেখবে না! ফরাসি সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তো তার নাতিই।

মারি লুইজার কাছে চিঠি লিখল নেপোলিয়ন। পরপর কয়েকটা। বক্তব্য প্রায় একই 'ফিরে এস'। কিন্তু কোনো জবাব পেল না নেপোলিয়ন। পাবার কথাও নয়। কারণ পথেই

চিঠিগুলো বেহাত হয়ে অন্য ঠিকানায় চলে যাচ্ছিল। এর কিছুদিন পরেই খবর এল, মারি লুইজার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই নেপোলিয়নের কাছে ফিরে আসবার। মারি লুইজা আর ফিরবে না। খুবই স্বাভাবিক। কারণ সে তখন কাউন্ট নিপার্গের শয্যাসঙ্গিনী। নিপার্গের নীল শিরায় ছিল অস্ট্রিয়া-ফ্রান্সের মিশ্রিত রক্ত। যুদ্ধে একটা চোখ হারিয়েছিল সে। তবে কালো একটা সিল্কের ফিতে দিয়ে ঢেকে মাথার পেছনে টানা দিয়ে বেঁধে রাখত। ইসরাইলের সেনাপতি ডায়ানের কায়দায়। মেটারনিকের কারসাজিতে নিপার্গ মারি লুইজার কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছিল। আর মেটারনিকের নির্দেশেই তার ছেলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভিয়েনায়। মেটারনিকের বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ। নইলে কী করে সে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে, আবার মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এবং চিরকালের জন্য।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল নেপোলিয়নের বুক চিরে। এল্‌বা থেকে দারুণ বিপদ মাথায় করে সমুদ্রে জাহাজ ভাসান, তারপর ইউরোপের মাটিতে পা দিয়ে ঝড়ের গতিতে এত দূর এগিয়ে আসার পেছনে স্ত্রী-পুত্রকে আবার দেখতে পাবার আশাই মস্ত অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল। এত বড় বিশ্বে নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হল।

তবে মনের সব অনুভূতি পেছনে ঠেলে ফেলে ব্যস্ত হয়ে উঠল নেপোলিয়ন। খবর এসেছে রহিন সীমান্তে নাকি ইংল্যান্ড ও প্রাশিয়া সৈন্য সাজাচ্ছে। অস্ট্রিয়া আর রাশিয়া সাজব-সাজব করছে। নিজের মনেই একবার হাসল নেপোলিয়ন। আশ্চর্য, সে তো যুদ্ধ চায় নি! সে চায় শান্তি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সৌহার্দ্য। অতীতে চেয়েছে, এখনো চায়, ভবিষ্যতেও চাইবে। অথচ এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে তাকে শুধু যুদ্ধই করতে হচ্ছে। কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

১২ জুন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিল নেপোলিয়ন। যুদ্ধের ডাক এসেছে। আর্থার ওয়েলেসলি—ডিউক অব ওয়েলিংটন এবং ব্লুকার একসাথে নেপোলিয়নকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছে। সুতরাং আর দেরি করল না নেপোলিয়ন। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুসেনার ওপর। লিগ্‌নির যুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে হারিয়ে দিল প্রুশীয়দের। ব্লুকার বন্দি হতে হতে বেঁচে গেল।

অন্যদিকে নেপোলিয়ন সেনাপতি নে-কে বলেছিল কাত্র ব্রা-এ গিয়ে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে একেবারে আটকে ফেলতে, যাতে তারা কিছুতেই প্রুশীয় বাহিনীর সাথে মিলতে না পারে। এই ব্যাপারে প্রথমটায় একটু ইতস্তত করল নে, একটু যেন ভয় পেল। শেষ পর্যন্ত যখন গেল, তখন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে এবং ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে। ততক্ষণে ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন এসে গেছে। সেনাপতি নে তার দেরির জন্য ইংরেজ বাহিনীকে আটকাতে পারল না। এই একটু দেরি, এই ভুল, নেপোলিয়নের জীবনে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনল।

লিগ্‌নির যুদ্ধের পর সমস্ত ছাউনি পরিদর্শন করল নেপোলিয়ন। চারদিকে প্রচুর আহত প্রুশীয় সৈন্য। নেপোলিয়ন নির্দেশ দিল, আহতদের চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। সৈন্য যখন আহত, তখন শত্রু-মিত্র বাছ-বিচার আছে? বেশ খানিকটা সময় গেল এতে।

শত্রু-মিত্র বিচার না করে আহতদের সম্পর্কে এই সতর্কতা, এই যত্নবোধ পরম মহত্ত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। কিন্তু গুরুতর যুদ্ধ যেখানে আসন্ন, যেখানে এতখানি সময় দেয়া মানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করা। ফলে পরবর্তী কাজে এগিয়ে যেতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেল তার।

সেনাপতি গ্রাউচের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল লিগ্‌নি থেকে পালিয়ে যাওয়া প্রুশীয়দের পেছনে ধাওয়া করে যেতে। একদিকে এই, অন্যদিকে সেনাপতি নে যদি কাত্র্ ব্রা দখল করতে পারত, তাহলে ওয়ার্টলু বলে কোনো যুদ্ধ হত কি না সন্দেহ আছে।

কাত্র্ ব্রা-এর ব্যর্থতার পর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল নেপোলিয়ন। কী আর করা! এরপর সেনাপতি নে-কে সঙ্গে নিয়ে ব্রুসেল্‌সের দিকে এগিয়ে গেল সে। প্রচুর ইংরেজ সেনাবাহিনী জড়ো হয়েছে সেখানে। পথের মধ্যে মাঝে মাঝেই আগুনে-রকেট ছুড়ে নেপোলিয়নের বাহিনীকে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হল। ঘায়েল যে একেবারে হল না, তা নয়।

অবশেষে বেলজিয়ামের মধ্যে ওয়ার্টলু বলে একটা গ্রামে উপস্থিত হল নেপোলিয়ন। চোখে পড়ল সেন্ট জাঁ বলে একটা উঁচু জায়গা। সেখানে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছে ওয়েলিংটন স্বয়ং।

আরো কিছুটা এগিয়ে গেল নেপোলিয়ন। লা বেল এলায়েন্স নামে একটা জায়গায় গিয়ে থামল—ছাউনি গাড়ল। শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। নেপোলিয়নের জীবনে তার প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে প্রকৃতির এই রুদ্ররোষ—নতুন কিছু নয়।

তার পরদিন। ১৮ জুন, ১৮১৫। ভোর ছটার সময় অন্যান্য সেনাপতিদের নিয়ে একসঙ্গে চা খেল নেপোলিয়ন। তার ভাই জেরোম ছিল সাথে। জেরোম বলল, সে নাকি শুনেছে প্রুশীয় সৈন্যরা ওয়েভার থেকে জোর কদমে এগিয়ে আসছে ওয়েলিংটনের সাথে মিলবে বলে।

'অসম্ভব কথা বলছ কেন?' ধমকে উঠল নেপোলিয়ন, 'যারা লিগ্‌নির যুদ্ধে অমন মার খেয়ে পিঠটান দিয়ে ছুটেছে, তারা আবার এগিয়ে আসবে, ইংরেজদের সাথে মিলবে? তুমিও যেমন, জিতব আমরাই, দেখে নিও! দেখছ না বৃষ্টি ধরে গেছে, মাটি এখন শুকিয়ে উঠবে ...।' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর নেপোলিয়ন তখন আর অন্য কোনো দিকে তাকাবার অবসর পাচ্ছে না। একেই বোধহয় বলে নিয়তির খেলা, বলে দুর্ভাগ্য।

চা খাবার পর ঘোড়ায় চড়ল নেপোলিয়ন। সৈনিকরা কোথায় কীভাবে নিজেদের সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে, তদারক করল। তারপর ফিরে এল দশটার সময়। জেরোমকে বলল, 'একটু ঘুমোতে যাচ্ছি। এক ঘণ্টা ঘুমোব। এগারটার সময় যদি না উঠি, আমাকে জাগিয়ে দিও।' শুতে গেল নেপোলিয়ন। বেলা এগারটার সময় ঘুম থেকে উঠল। একটু ঘুমিয়ে শরীরটা বেশ তাজা, ঝরঝরে লাগছে। এবার যুদ্ধ।

এ কোন্ নেপোলিয়ন! যে কিনা একনাগাড়ে আঠার ঘণ্টা কাজ করেও যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো ক্লান্ত হয় নি, বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন মনে করে নি—সে আজ কোথায় এসে কী করল! ভিজে মাটিতে খড় বিছাল, ঘুমিয়ে নিল, যখন কিনা এক মিনিটও সময় নষ্ট করার কথা ছিল না। চরম সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে এ ধরনের শৈথিল্য নেপোলিয়নকে কী করে বশীভূত করল জানি না, তবে নেপোলিয়নের জীবনে এই ভুল চরম ভুল। ইতিহাস নেপোলিয়নের এই ভুলকে কখনোই ক্ষমা করে নি।

বেলা এগারটার সময় তৈরি হল সে। বাহাত্তর হাজার সৈন্য আর দু শ ছেচল্লিশটা কামান রয়েছে তার হাতে। আর ওয়েলিংটনের অধীনে আটষট্টি হাজার সৈন্য আর এক শ ছাপ্পান্নটা কামান।

বেলা সাড়ে এগারটায় কামান দাগতে আদেশ দিল নেপোলিয়ন। শুরু হল ওয়ার্টলু'র যুদ্ধ। প্রথমটায় ঘণ্টা দেড়েক গোলাগুলি চলল। তারপর পুরোপুরি আক্রমণ চালাল নেপোলিয়ন।

বেলা দেড়টার সময় অবাক হয়ে দখল সে, ওপক্ষের ছাউনিতে কারা যেন দলে দলে এসে যোগ দিচ্ছে এবং এ দিকের ডানদিক লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে তারা। কিছুক্ষণ পরই নেপোলিয়ন বুঝতে পারল, ওরা প্রুশীয় সেনাবাহিনী। ব্লুকারের দল। লিগ্‌নির অমন যুদ্ধে ব্লুকারের দল শেষ তো হয়ই নি, তার ওপর ওরা যাতে ওয়েলিংটনের দলের সাথে কিছুতেই মিলতে না পারে, সেজন্য অত কাণ্ড করে লিগ্‌নির যুদ্ধে জয়লাভ কোনো কাজেই এল না। বুঝতে পারল নেপোলিয়ন, হিসেবে কোথায় যেন একটু ভুল হয়ে গেছে। তাই এবার সব কাজে শুধু গরমিল হবার পালা।

ভয়াবহ চেহারা নিল যুদ্ধ। প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল নেপোলিয়ন। তবে অবস্থা বেশি ভালো ঠেকল না। রিজার্ভ ফোর্স থেকে দশ হাজার সৈন্যের একটা দল পাঠাল লড়াই করতে। সেনাপতি নে সাড়ে ছটার সময় লা হে সেন্ট নামে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা দখল করে ফেলল। অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হল।

এবার পুরোমাত্রায় ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে চাপ বাড়াল নেপোলিয়ন। কিছুতেই যেন ব্লুকারের আর কোনো নতুন বাহিনী ওয়েলিংটনের সাথে যোগাযোগ করতে না পারে—কিছুতেই না। এজন্য অজেয় ইম্পিরিয়াল গার্ডকে যুদ্ধে নামাল সে। একসাথে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য।

ফরাসি আক্রমণে অস্থির হয়ে উঠেছে ওয়েলিংটন। বারবার খবর পাঠাচ্ছে ব্লুকারকে, '... শিগ্‌গির সেনাবাহিনী পাঠান। নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনীর একেক জন সৈনিক দশ-দশটা বাঘের মতো লড়াই করছে ... শিগ্‌গির...

দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল নেপোলিয়নের। দেখা গেল, ব্লুকারচালিত তাজা একটা প্রুশীয় বাহিনী এসে যোগ দিয়েছে ওয়েলিংটনের সাথে। তারা এসেই প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল ফরাসি বাহিনীর ওপর।

আর পারা গেল না। সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে! রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ফরাসি বাহিনী। ইংল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীত ভেসে এল নেপোলিয়নের কানে। '... গড্ সেভ দ্য কিং,' শোনা গেল প্রুশীয় সেনারা গাইছে, 'হে ঈশ্বর, তোমার বন্দনা করি... ।'

শেষ হল ওয়ার্টলু'র যুদ্ধ। সেই সাথে শেষ হল নেপোলিয়নের কর্মবহুল, বহু যুদ্ধখ্যাত জীবনের একটা বিরাট অধ্যায়। বুঝতে পারল সে, তার জীবনের সব কাজের এখন সারা। এবার জীবনের শেষ অঙ্ক শুরু হবে অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে...

প্যারিসে ফিরে এল নেপোলিয়ন। ফেরার পথে মাঝে মাঝে থেমে ভেবেছে, আবার কি কিছু একটা করা যায় না? না, আর কিছুই করবার ছিল না। ২১ জুন সকালবেলা বড় সাধের রাজধানীতে ফিরে এল সে।

যুদ্ধমন্ত্রী এসে খবর দিল, এসেম্বলি সভা ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। তাকে এখনই ভেঙে দিতে হবে।

'সে কী! আমি তো মরি নি! আমি বেঁচে থাকতেই আমার এসেম্বলিকে ভেঙে দিতে হবে?'

শুধু কী এইটুকু? একজন প্রিভি কাউন্সিলর এসে বলল, 'সিংহাসন ত্যাগ করুন, এছাড়া কোনো উপায় নেই।'

সত্যি উপায় ছিল না। কারণ নেপোলিয়ন যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, শান্তি আসবে না। শত্রুপক্ষ শান্তি আসতে দেবে না। প্যারিসের দিকে ছুটে আসছে তারা।

'সিংহাসন ত্যাগ না করলে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত হতে হবে... ।'

নেপোলিয়নকে বলা হল, এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয় স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করবে, নইলে বিতাড়িত হবে। সময় নেই, মাত্র এক ঘণ্টা।

উত্তেজনায় একবার লাফিয়ে উঠল নেপোলিয়ন। পর মুহূর্তেই আবার শান্ত হয়ে গেল। লুসিয়েনকে ডেকে তার সিদ্ধান্ত লিখে নিতে বলল।

নেপোলিয়ন বলল, লুসিয়েন লিখল, 'প্রিয় ফরাসিগণ, আমার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটেছে। আমি আমার সন্তান দ্বিতীয় নেপোলিয়নকে ফরাসি জনগণের সম্রাট বলে ঘোষণা করছি।'

তিন দিন পর মালমেইসন প্রাসাদে চলে গেল নেপোলিয়ন। তখনো মনে আশা, এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে জীবনের মোড় ঘুরে যাবে, নিদেনপক্ষে একজন সেনানায়ক হয়েও যদি দেশের মাটিতে থাকবার অনুমতি পায়... ।

কিন্তু কিছুই হল না। অষ্টাদশ লুইকে ফিরিয়ে আনার সব রকম ব্যবস্থা করা হল। প্যারিসের দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হল ডিউক অব ওয়েলিংটন স্বয়ং। অর্থাৎ বাচ্চা নেপোলিয়ন, বাপের বড় সাধের 'কিং অব রোম', কোনোদিনই আর দ্বিতীয় নেপোলিয়ন নামে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে না।

এরপর কী আছে ভাগ্যে, জানে না সে। আবার যেতে হবে নির্বাসনে। কিন্তু কোথায়...। আমেরিকা চলে গেলে হয় না? এখনই যদি না যায়, আর সময় কোথায়? শত্রুরা প্যারিসে ঢুকেই তো সব গুঁড়িয়ে দেবে। পালাবার পথ কোথায়? ইংলিশ চ্যানেল তো ইংরেজরা বন্ধ করে রেখেছে। এখন একমাত্র পথ বিস্কে উপসাগর।

২৯ জুন। বিস্কে উপকূলের উদ্দেশে প্যারিস ত্যাগ করল নেপোলিয়ন। রকফোর্ট পৌঁছল ৩ জুলাই, সকালবেলা। পৌঁছেই অবাক হয়ে দেখল, সেখানেও পথ বন্ধ। পথ বন্ধ করে আছে তিনটা ইংরেজ জাহাজ। একটা বেশ বড়। নাম 'বেলরোফোন'। 'আশ্চর্য, যেখানে পানি, সেখানেই ইংরেজ!' নিজের মনে বিড়বিড় করল নেপোলিয়ন।

কী করবে এখন, কোনো মালবাহী জাহাজে করে পালিয়ে যাবে আমেরিকা? কিন্তু আর কত দূর? কত দূরে পালাবে নেপোলিয়ন। একবার আকাশের দিকে তাকাল সে। তারপর তাকাল সমুদ্রের দিকে। মনে হল আকাশ, সমুদ্র, চারদিকের প্রকৃতি—সবকিছু যেন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। সুতরাং আর কোনো আশা নেই, নেই কোনো আকাঙ্ক্ষা! এবার সবকিছুর অবসান, সবকিছুতে ছেদ। তবু একটা চিঠি লিখল ইংল্যান্ডের কাছে, নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের কাছে আশ্রয়প্রার্থী। সে আশা করে ইংল্যান্ড তাকে প্রাপ্য সম্মান ও আতিথেয়তাদানে বিরূপ হবে না... ।

বেলরোফোনের ক্যাপ্টেন মেইটল্যান্ডের হাতে পৌঁছল চিঠিটা। মেইটল্যান্ড মুখে বলে পাঠাল, নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডে সম্মানের সাথে গৃহীত হবে। ইংরেজরা বন্ধুবৎসল, মহৎ এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী...

স্থির মনে, ধীর পদক্ষেপে জাহাজের দিকে এগোল নেপোলিয়ন। ক্যাপ্টেন মেইটল্যান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করল। ওয়ার্টলু যুদ্ধের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটল।

দশ দিন পর ইংল্যান্ডের প্লিমাউথ বন্দরে নোঙর করল বেলরোফোন। বন্দরসুদ্ধ লোক ভেঙে এল দেখতে। ইউরোপের সিংহ নাকি ওই জাহাজে বন্দি হয়ে আছে।

তিন দিন কেটে গেল। চার দিনের দিন কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী ঢুকল নেপোলিয়নের কেবিনে। একটা চিঠি রাখল টেবিলে। ইংল্যান্ডের রাজাকে লেখা নেপোলিয়নের সেই চিঠির জবাব। রাজা নিজে লেখে নি। লিখেছে ইংরেজ সরকার। নেপোলিয়ন সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত রয়েছে ওই চিঠিতে।

বুক ভরে শ্বাস নিয়ে চিঠিটা খুলল নেপোলিয়ন। পড়ল, তারপর নীরবে রেখে দিল টেবিলের ওপর। ইংল্যান্ড ও তার মিত্রপক্ষের সিদ্ধান্ত হয়েছে—এবার নেপোলিয়নের নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থল সেন্ট হেলেনা। ফ্রান্স থেকে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল আর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে বার শ চব্বিশ মাইল দূরে বিক্ষুব্ধ আটলান্টিকের বুকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপ। স্বদেশভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সেন্ট হেলেনা...

'আমি তো যুদ্ধবন্দি নই', রুদ্ধকণ্ঠে বলল নেপোলিয়ন, 'আমি এই জাহাজে স্বেচ্ছায় এসেছি। কারণ আমি আপনাদের সৌজন্য ও আতিথেয়তায় বিশ্বাস করেছিলাম। আমি অনায়াসে আমার সৈন্যদের মাঝে ফিরে গিয়ে নিজেকে গোপন করতে পারতাম। ক্যাপ্টেন কথা দিয়েছিল, আমাকে নাকি ইংল্যান্ডে সম্মানের সাথে আশ্রয় দেবে। আজ আমি বঞ্চিত, প্রতারিত। ইংল্যান্ডের এই আচরণ তার জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করেছে, অপমান করেছে।'

একটু থেমে আবার বলল সে, 'আমি বাঁচব না। সেন্ট হেলেনা আমাকে তিন মাসের মধ্যে মেরে ফেলবে।'

নেপোলিয়ন বাঁচবে কি ক মাসের মধ্যে মারা যাবে, এই নিয়ে ইংল্যান্ড বা তার মিত্রপক্ষের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তারা ফিরেও তাকায় নি নেপোলিয়নের মানসিক অনুভূতির দিকে। তাই একদিন যখন নেপোলিয়নের কাছ থেকে তার যা-কিছু টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র নিয়ে নেয়া হল, তখন কারো মনেও হল না, কতখানি ব্যথায় ভরা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল সম্রাট নেপোলিয়ন।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। 'বেলরোফোন' থেকে 'নর্দাম্বারল্যান্ড' নামে আরেকটি জাহাজে স্থানান্তরিত করা হল নেপোলিয়নকে। সঙ্গে রইল তিন জন কর্মচারী, এক জন ডাক্তার আর বারজন ভৃত্য।

আগস্ট মাসের এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে দুলে উঠল 'নর্দাম্বারল্যান্ড'। ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল ইউরোপের তীরভূমি। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে গাঢ় হল সমুদ্রের পানি। মুছে গেল ইউরোপ। প্যারিস—কোথায় পড়ে রইল প্রিয় প্যারিস। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে এক ঊর্ধ্বাকাশে তাকাল নেপোলিয়ন। রাতের কুয়াশায় আকাশের তারা ম্লান, অস্পষ্ট। চারদিকে শুধু অন্ধকার...

বিদ্যুৎগতি অশ্বপৃষ্ঠে সদা-ধাবমান জীবন এবার শুধু দিনযাপনের ক্লান্তিতে নিস্তেজ। ঈগল পাখির বিস্তৃত পাখা এখন গুটিয়ে যাচ্ছে সাড়ে দশ মাইল লম্বা, সাড়ে ছ মাইল চওড়া সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। কোন প্রাচীন অতীতে আগুন উদ্‌গীরণ করত। আগুন নিভে গিয়ে সেই আগ্নেয়গিরি এখন হয়েছে রুক্ষ পাথুরে দ্বীপ। এক মৃত আগ্নেয়গিরিতে আশ্রয় নিয়েছে আরেক অগ্নিগর্ভ মানুষ। বিশাল সমুদ্রে জাহাজে ভেসে যাওয়া-আসার পথে এটা ছিল ক্ষণিকের আশ্রয়স্থল। অবশ্য এখানে বিশ্রাম হলেও শ্রান্তি যেত না, বরং মন ভার হয়ে উঠত জমাটবাঁধা লাভার কালো কালো পাথর দেখে। দূর থেকে দ্বীপটাকে মনে হত ভূতুড়ে, বিশ্রী একটা গা-

ছমছমে চেহারা। ক্রমে জাহাজ চলাচল যখন বাড়ল, দেশে-বিদেশে জিনিসপত্রের আনাগোনা নিয়মিত হল, তখন সেন্ট হেলেনাতেও কিছু কিছু চাষ-আবাদ হতে লাগল। গাছগাছালি লাগানো হল, কিছু কিছু বাড়িঘর হল। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা হল পাঁচ শ আর তাদের সেবা করার জন্য ক্রীতদাস হিসেবে রইল বার শ নিগ্রো।

প্রথম কয়েক দিন একটা বেসরকারি বাড়িতে রাখা হল নেপোলিয়নকে। তারপর নিয়ে যাওয়া হল ইংরেজ সরকার-নির্দিষ্ট বাসস্থানে। বাড়িটার নাম 'লং উড'। আগে ছিল গোলাবাড়ি আর তার সাথে লাগোয়া গোয়ালঘর। এখন হয়েছে নির্বাসিত সম্রাটের বাসস্থান। বাড়িটা যেমন নড়বড়ে, তেমনি সেঁতসেঁতে। 'নর্দাম্বারল্যান্ড' জাহাজে যেসব ছুতোর মিস্ত্রিরা ছিল, তাদের বলা হল বাড়ির মেঝেতে তক্তা পেতে একটু ঠিকঠাক করে দিতে। তক্তা তারা পেতে দিল ঠিকই, তবে তলায় অনেক দিন থেকে জমে ওঠা গোময় ও অন্যান্য নোংরা জঞ্জাল পরিষ্কার করার প্রয়োজন মনে করল না। সুতরাং নেপোলিয়ন আর তার সঙ্গীসাথীরা যখন ওখানে ঢুকল, তাদের পায়ের চাপে বসে গেল তক্তাগুলো। সাথে সাথে অতীতের পুঞ্জীভূত রুদ্ধ পূতিগন্ধে ভরে গেল চারদিক। নেপোলিয়ন নাকি পরিষ্কার পরিবেশ পছন্দ করত। বিশেষ করে যে-কোনো গন্ধ সম্পর্কে নাকি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছিল অত্যন্ত সজাগ। যার জন্য তার প্রাসাদে বসবার এবং শোবার ঘরে সুগন্ধি ছড়ানো হত। জ্বালানো হত সুগন্ধি কাঠ।

সত্যিই, সেন্ট হেলেনায় থাকতে হলে অনেক সাহস, অনেক শক্তি ধরতে হবে নেপোলিয়নকে।

লং উডের বাড়িতে ছিল খাওয়া-শোয়া ইত্যাদির জন্য খানচারেক ঘর। নোনা লেগে জায়গায়-জায়গায় আস্তর উঠে গেছে। দেয়ালের পাশে লোহার খাট, এক কোণে ফায়ার প্লেস, তার কাছে একটা সোফা। নেপোলিয়নের নির্বাসিত জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে এই ফায়ার প্লেসের পাশে বসে।

খাবার ঘরটা ছিল প্রায় অন্ধকার। তার লাগোয়া একফালি ঢাকা জায়গা। সেখানে ছিল বিলিয়ার্ড খেলার একটা পুরোনো টেবিল।

বসবার ঘরটা সাজানো ছিল বৈ কী। তবে সেখানে ছিল পোকায় খাওয়া মেহগনি কাঠের একসেট সোফা।

রান্নাঘরের সাথে চাকর-বাকরদের ঘর। ছাদ একটা ছিল যদিও, কিন্তু ফুটো। বৃষ্টি নামলেই চুইয়ে পড়ত পানি। এছাড়া গোটা বাড়িটা ছিল বাদামি রঙের ইঁদুরে ভর্তি। খাবার সময় বড় বেশি ছোটাছুটি করত।

রাজার বাড়িই বটে!

শোবার ঘর আর বসবার ঘরের মাপ ছিল চোদ্দ ফুট লম্বা আর বার ফুট চওড়া। মাথার ওপর ছাদ দশ ফুট উঁচু। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের 'অন্ধকূপ' নামে ঘরটা কিন্তু এরচাইতে আরেকটু বড় ছিল। লম্বা আঠার ফুট, চওড়া চোদ্দ ফুট দশ ইঞ্চি। তাই নিয়ে তো ইংরেজদের কত অভিযোগ! কত গল্প-কাহিনী!

রাত দুটোর সময় উঠে এক কাপ চা বা কফি খেত নেপোলিয়ন। তারপর দাড়ি কামিয়ে, মুখ ধুয়ে পোশাক পরত। পোশাকের ওপর ছড়িয়ে দিত সুগন্ধি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ঘোড়ায় চড়ে একটু বেড়াতে যেত। দুপুরের খাওয়া খেত দশটায়। খাওয়ার মেনু ছিল স্যুপ অথবা ডিম-মেশানো গরম দুধ, একটু মাংস, সব্জি, তার সাথে পনির আর সবার শেষে এক কাপ কফি।

দুপুরবেলা ঘণ্টা তিনেক ধরে নেপোলিয়ন বলে যেত তার জীবন-কাহিনী। একজন টুকে নিত। তারপর গোসল সারত। সন্ধ্যার দিকে আবার বেরোত। এবার যেত গাড়িতে। বাড়ি ফিরে এসে দুপুরে লেখা ইতিহাসের অংশটা দেখত, সংশোধন করত।

নেপোলিয়ন রাতের খাওয়াটা প্রায়ই খেত সেন্ট হেলেনায় তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে। মোমবাতির আলোয় ডিনারটা নেপোলিয়নের ভালোই লাগত। রাত এগারটার সময় সবাইকে 'শুভ রাত্রি' জানিয়ে শুতে চলে যেত।

সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়নের গতিবিধি ছিল একেবারে নিয়ন্ত্রিত। অত্যন্ত কড়া দৃষ্টিবদ্ধ। দিনের বেলায় এক শ পঁচিশ জন, রাতে বাহাত্তর জন প্রহরী অতন্দ্র পাহারা দিত খাঁচায় আটকানো সিংহকে। সিংহটা নাকি পালিয়ে যাবার অনেক কৌশল জানে।

নেপোলিয়ন নিজের মনে মাঝেমধ্যে বলে উঠত, 'আশ্চর্য, ওরা আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে দেবে না যে আমি ওদের হাতে বন্দি!'

নেপোলিয়ন যখন প্রথম সেন্ট হেলেনায় আসে, তখন ওখানকার ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী ছিল অ্যাডমিরাল ককবার্ন। ককবার্ন লোক ভালো ছিল। নেপোলিয়ন তার সাথে মাঝেমধ্যে গল্প করত, হাসত, বেড়াত। তবে ককবার্ন ছিল মাত্র ছ মাস। তারপর যে গভর্নর হয়ে এল সেন্ট হেলেনায়, তার নাম হাডসন লো। বয়স প্রায় ছেচল্লিশ। রোগাটে, ছিপছিপে চেহারা। ঝুলেপড়া ভুরুর নিচে চকচকে, কোঁচকানো চোখ। মাথার চুল পাঁশুটে। ছেলেবেলায় মা মারা যাবার পর স্নেহ বস্তুটির সাথে হাডসন লো-এর বিশেষ পরিচয় ছিল না। আলাপে-ব্যবহারে ছিল অতি ভাবলেশহীন। নেহাত মৌখিক সৌজন্য যতটুকু না দেখালে নয়, ততটুকুই দেখাত। হাডসন লো জীবনে যুদ্ধ করেছে অনেক, অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। ফরাসি ও ইতালি—দু ভাষাতেই কথা বলতে পারত। নেপোলিয়ন প্রথমটায় ইতালি ভাষায় কথা বলে হাডসনের মনের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারে নি। তার আবেগহীন, ঠাণ্ডা ব্যবহারে নেপোলিয়ন পরে মন্তব্য করেছিল, 'লোকটা সোজা দৃষ্টিতে তাকাতে পারে না। আর মুখ দেখে বোঝা যায় না তার মনের মধ্যে কী আছে।' অর্থাৎ হাডসন যে সহজ-সরল পথের লোক নয়, সেটা নেপোলিয়ন প্রথম থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল। প্রথম প্রথম নেপোলিয়ন হাডসনকে একটু খোশমেজাজে রাখবার চেষ্টা করেছিল, যাত লং উডের চারদিকে যে সুদীর্ঘ পাঁচিল দেওয়া আছে, তার বাইরেও যেন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। অনুরোধ করল নেপোলিয়ন, ওইটুকু স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হোক।

'আমি ঘোড়ায় চড়ে ইচ্ছেমতো বেড়াতে পারি না, এই দ্বীপের লোকদের সাথে একটু মন খুলে কথা বলতে পারি না। বলুন তো, এভাবে কি শরীর-মন ঠিক থাকে? আপনি পারেন না এই নিষ্ঠুর নিয়ম তুলে দিতে?' বড় আশায় হাডসন লো-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নেপোলিয়ন।

যথারীতি ভাবলেশহীন মুখে জবাব দিল হাডসন, 'এ তো সরকারের নির্দেশ, মানতেই হবে... ।'

'তার মানে আপনি কিছুই করবেন না? আমার এই চার দেয়ালের বাইরে পা দেবার অধিকার থাকবে না? তাহলে এই ক্লান্তিকর দিনগুলো কাটাব কী করে! আমি এখান থেকে কোনো লোকের মুখ দেখি না, গাছপালা... কিচ্ছু দেখতে পাই না... ।' অনুনয়, অভিযোগ দুই-ই ঝরে পড়ল নেপোলিয়নের কণ্ঠে।

'আমরা আপনাকে একটা নতুন বাড়ি করে দেব। নতুন ফার্নিচার দিয়ে সাজিয়ে

দেব...।' সেই উত্তাপহীন, সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা জবাব। কী কৌশলেই না নেপোলিয়নের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাওয়া।

নেপোলিয়ন সেদিন চিৎকার করে বলেছিল, 'আমি সামরিক লোক, আপনিও তাই। আপনি তো জানেন, ফার্নিচার নতুন কি পুরোনো; সোফার ঢাকনা ভেলভেটের কি সুতির, তা নিয়ে আমরা সৈনিকরা মাথা ঘামাই না।'

নেপোলিয়ন ভেবেছিল, তার এই উত্তেজনা, এই কথাবার্তা বুঝি হাডসন লো–এর মনের অনুভূতির তারে আঘাত করবে, আর এই আঘাতে বুঝি সেই তারে কোনো নতুন সুর বেজে উঠবে। কিন্তু হায় রে, নেপোলিয়ন জানত না, হাডসনের মনে অনুভূতি–টুতি বলে কিছুই ছিল না, তার বে–তার মনে কোনো কিছুরই সুর বাজত না। তাই নেপোলিয়নের এত কথার একটারও কোনো জবাব না দিয়ে নীরবে উঠে গেল হাডসন লো। তার ঝুলেপড়া ভুরুর নিচে বিষমাখানো দুটো তীরের ফলা দেখতে পেল নেপোলিয়ন।

এক কাপ কফি পড়ে ছিল সামনে। নেপোলিয়নের মনে হল, হাডসন লো–এর চোখের দৃষ্টিতে বিষিয়ে গেছে ওই কফি। ভৃত্যকে ডেকে কাপটা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে বলল সে। আর সেদিন থেকে বিষের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল দুজন দুজনকে। ছুতোনাতায় তিক্ত থেকে তিক্ততর হতে লাগল দুজনের সম্পর্ক। নেপোলিয়নের সাথে ঠিক বন্দি–শত্রুর মতো ব্যবহার শুরু করল হাডসন লো।

এরপর থেকে আরো কড়া হল পাহারা। বেড়ে গেল প্রহরীর সংখ্যা। ক্রমে নেপোলিয়নের বিকেলবেলা একা বেরোবার যে স্বাধীনতাটুকু ছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল। চারদিক থেকে গুপ্তচক্ষু নেপোলিয়নকে লক্ষ্য করতে লাগল আর সমানে গভর্নরের কাছে খবর যেতে লাগল, 'জেনারেল বোনাপার্ট সীমানার বাইরে বেড়াচ্ছেন, বোনাপার্ট একা বেড়াচ্ছেন, বোনাপার্টের সাথে লোক আছে, বোনাপার্ট আজ অসুস্থ'... ইত্যাদি আরো কত কী।

এছাড়া অনুমতিপত্র ছাড়া লং উডের ধারেকাছে কাউকে আসতে দেয়া হত না। সেন্ট হেলেনার শহর জেম্‌স টাউনের রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল—খবরদার, কেউ যেন ওই ফরাসি লোকটার সংস্পর্শে না আসে। ওর সাথে কথা না বলে। এমনকি নেপোলিয়নের এক বন্ধু যখন '১৮১৫ সালের ফরাসি দেশ' নামে একটা বই লিখে উপহার পাঠাল, সেটা পর্যন্ত হাডসন লো আটকে ফেলল। অপরাধ, সেন্ট হেলেনায় আসবার পর তো নেপোলিয়ন 'সম্রাট' ছিল না। ছিল বড়জোর 'জেনারেল,' তাহলে কেন ঠিকানায় লেখা হল 'সম্রাট নেপোলিয়ন'?

ইংল্যান্ডের রাজ–প্রতিনিধির কাছে নেপোলিয়ন চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল, তার স্ত্রী আর ছেলে কেমন আছে। সেই চিঠিটা পর্যন্ত আটকে ফেলল হাডসন। মিথ্যে মিথ্যে খবর পাঠাতে লাগল, নেপোলিয়নের মতিগতি ভালো নয়, কেমন যেন কিছু একটা করবার মতলব...।

আর এর পরেই এল নেপোলিয়নের জীবনে, তার ব্যক্তিত্বে চরম ধাক্কা। নেপোলিয়ন সেদিন বাড়ির সামনে পায়চারি করছিল। এমন সময় হাডসন এসে দাঁড়াল সামনে। ঠাণ্ডা, নিরুত্তেজ গলায় বলল, 'লং উডের খরচটা একটু বেশি হচ্ছে। বিশেষ করে খাওয়ার খরচ। ওটা কমাতে হবে।'

রাগে, দুঃখে কিছুক্ষণ কথা বেরোল না নেপোলিয়নের মুখ দিয়ে। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'আপনাকে কে বলেছে আমাকে খাওয়াতে হবে? আমি এখনই ওই সেনানিবাসে চলে যাচ্ছি। গিয়ে বলব, আমি ইউরোপের বয়োজ্যেষ্ঠ সৈনিক। আমি তোমাদের সাথে থাকব। আমাকে দুটো খেতে দিও।'

সেখানেই থামল না নেপোলিয়ন। আরো বলল, 'মনে রাখবেন, যখন ইংল্যান্ড থাকবে না, ইউরোপ থাকবে না, যখন আপনাকে সবাই ভুলে যাবে, তখনো সম্রাট নেপোলিয়ন বেঁচে থাকবে। তাকে বন্দি করে রাখবার অধিকার আপনার নেই। কে আপনি?'

আশ্চর্য, এত কথার জবাবে হাডসন লো বলল, 'আপনি আমাকে হাসালেন...

'আমি আপনাকে হাসালাম?' নেপোলিয়ন ভেবে পাচ্ছে না লোকটার নির্লজ্জতা আর কত দূর যাবে!

'হ্যাঁ, আপনি আমাকে হাসিয়ে ছাড়লেন। কী সব বললেন, কত কড়া কড়া কথা শোনালেন। সত্যি, আমার অনুকম্পা হচ্ছে। যাকগে সে কথা, আপনার দিন ভালোই যাক।'

চলে গেল হাডসন লো। মুখটা আগুনের মতো লাল।

এরপর শুরু হল অপমানের পর অপমান, আঘাতের পর আঘাত। লং উডের সীমানা পাঁচিল সরিয়ে এনে সঙ্কুচিত করা হল বাড়ির চারপাশের পরিধি। আরো নিয়ন্ত্রিত হল নেপোলিয়নের গতিবিধি। চরম অপমান আর সবচাইতে বেদনাময় শাস্তি হল, যখন দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় টান ধরানো হল। নেপোলিয়ন ও তার সঙ্গী সাথীদের খাবারের জন্য বছরে খরচ পড়ত কুড়ি হাজার পাউন্ড। এবার নির্দেশ এল, এখন থেকে ইংরেজ সরকার দেবে বার হাজার পাউন্ড। তার বেশি খরচ হলে নেপোলিয়ন যেন নিজের গাঁট থেকে দেয়।

একটা লোকের নীচতা আর কতখানি নামতে পারে! অপমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের যা কিছু রুপোর বাসনপত্র ছিল, সব হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে জেম্‌স টাউনের বাজারে বিক্রি করতে পাঠিয়ে দিল নেপোলিয়ন। সে নাকি একবার খেদের সঙ্গে বলেছিল, 'এরপর বাকি রইল আমার গায়ের জামাকাপড়। এগুলোও একদিন বিক্রি করতে হবে... ।

এবার টান ধরানো হল কয়লা আর কাঠে। সেন্ট হেলেনার সেঁতসেঁতে আবহাওয়ায় লং উডের বাড়িতে জুতো, জামাকাপড় সব ভিজে উঠতে লাগল। নেপোলিয়ন এবার ক্রোধের আগুনে আহুতি দিল তার নিজের খাট আর র‍্যাকের কাঠ। যতক্ষণ ওগুলো পুড়ল, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

ক্রমে বাইরে যাওয়া কমিয়ে দিল নেপোলিয়ন। ইচ্ছে থাকলেও যেত না। বড় বিরক্ত লাগত, অস্বস্তি হত। কারণ, যখনই বাইরে যেত, সঙ্গে থাকত প্রহরী। একটু ঘাড় ফেরালেও ওরা ফিরে তাকাত। মনের স্বাধীনতা এভাবে বিসর্জন দিয়ে আর যাই হোক, মুক্তবায়ু সেবন করা যায় না। কিন্তু চব্বিশটা ঘণ্টা সে কাটাবে কী করে!

হঠাৎ বাগান করার জন্য উঠেপড়ে লাগল নেপোলিয়ন। বাড়ির সামনে এই রুক্ষ পাথুরে জায়গায় দেখাই যাক না সবুজ কিছু ফলানো যায় কি না। কিছুদিন পরেই দেখা গেল, একটা স্ট্র হ্যাট মাথায় দিয়ে শার্ট-ট্রাউজার পরে ভোর থেকে মাটি কোপাচ্ছে নেপোলিয়ন। ঘাসের চাপড়া তুলছে, বীজ বুনছে, চারা পুঁতছে। মাত্র সাত দিনের মধ্যে পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল বাগানে। প্রহরীরা তাকিয়ে দেখত আর বিস্মিত হত। কে বলবে, ওই ফুল-ফোটানো লোকটাই এককালে কামান দেগে গোটা ইউরোপকে কাঁপিয়েছে।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে ধর্মচিন্তা খুব কৌতূহলী করে তুলেছিল নেপোলিয়নকে। বিশেষ করে নরক কী এবং খ্রিস্টধর্মকে মেনে না চললে মুক্তি আছে কি নেই—এই দুটো বিষয় অত্যন্ত জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল তাকে। বার্টর‍্যান্ড নামে তার এক সঙ্গীকে দিয়ে সে একটা চিঠি লিখিয়েছিল, যাতে সেন্ট হেলেনায় একজন শিক্ষিত, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন যাজক পাঠানো

হয়, আর তার সাথে একজন ভালো ডাক্তার। বছর দেড়েক পর নেপোলিয়নের অনুরোধ রক্ষা করা হয়েছিল। দুজন কর্সিকান যাজককে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। জরাগ্রস্ত। কানে শোনেন না। কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়। কোনোমতে প্রার্থনা-বাণী আউড়ে যান। আরেকজন ছিল ছোকরা। লেখাপড়া জানে সাধারণ। সুতরাং এই দুজনের কেউই ধর্ম সম্পর্কে নেপোলিয়নের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার যোগ্যতা নিয়ে আসে নি। আর ডাক্তার হিসেবে যাকে নিয়ে আসা হল, তার অভিজ্ঞতা কতখানি! কর্সিকায় লাশকাটা ঘরে সহকারী কর্মচারী ছিল সে। এবং তার গোটা কাজটাই ছিল মৃতদেহ নিয়ে, জীবিত মানুষকে নিয়ে সে কোনোদিন নাড়াচাড়া করে নি।

এদের কাউকেই নেপোলিয়নের ভালো লাগল না। তবু যখন এসেই গেছে, কিছু একটা করা দরকার। নেপোলিয়ন তার খাবার ঘরটাকেই ধর্মঘর করল। সেখানেই প্রতি রোববার ধর্মীয় আলোচনা হত। অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে সেন্ট হেলেনার দুঃস্বপ্নের দিনগুলো কাটিয়ে যাওয়া—আর কিছু নয়।

দিন কাটতে লাগল। তীব্র যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে পার হতে লাগল সময়। নেপোলিয়নের অমন পেটাই-করা স্বাস্থ্য এতদিন পর্যন্ত এতটুকু ক্ষয়ে যায় নি। কিন্তু তার পরেই সেন্ট হেলেনার ভিজে অথচ রুক্ষ আবহাওয়া শরীরের মধ্যে কেমন যেন সব বানচাল করে দিল। মাঝেমধ্যেই বহুদিনের একটা ব্যথা পেটের ডান দিকটাকে অসাড় করে দিত। এর ওপর আবার চিরকাল ছুটে বেড়ানো কর্মব্যস্ত নেপোলিয়নের প্রতি মুহূর্তের চলাফেরা হার্ডসন লো-এর রক্তচক্ষুর নিয়ন্ত্রণে এমনভাবে বাধা পেতে লাগল যে তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খিল ধরে গেল। দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল পেটের যন্ত্রণা। সেই সাথে কেমন গা-বমি-বমি ভাব আর মাথা ঘোরা।

ডাক্তার এল। ডাক্তার স্টোক, নৌবাহিনীর ডাক্তার। স্টোক খুব যত্ন করে নেপোলিয়নকে খুঁটিয়ে দেখল, জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক কিছু খবর নিল। তারপর বলল—লিভারের অসুখ। হেপাটাইটিস।

'অসুখটা কি খারাপ?' জানতে চাইল নেপোলিয়ন।

ডাক্তার স্টোক একবার তাকিয়ে দেখল শুয়ে-থাকা অসুস্থ সম্রাটকে। তারপর বলল, 'লিভার পেকে গেলে, পুঁজ হলে খারাপ। আরো খারাপ যদি ফেটে যায় এবং স্টমাকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তাহলে মৃত্যু দোরগোড়ায় এসে গেছে বলতে হবে।'

ডাক্তার স্টোক একটু বেশি যত্ন নিয়ে দেখেছিল নেপোলিয়নকে। হাডসন লো-এর হায়েনা-চোখে এটা খুব ভালো ঠেকল না। কয়েক দিন পর সামরিক বিচারালয়ে ডাক পড়ল স্টোকের। সেখানে সে দোষী সাব্যস্ত হল। চাকরি গেল।

এরপর দীর্ঘ আট মাস কেটে গেল বিনা ডাক্তারে, বিনা চিকিৎসায়। একমাত্র ডাক্তার ছিল সেই লাশকাটা ঘরফেরত মানুষটা, যার সাথে জীবিত মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

১৮২০ সালের জুলাই মাস। অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল নেপোলিয়ন। এবার রোগের দাপটটা বড় বেশি। সেই লিভারে ব্যথা। নেপোলিয়নের ভাষায়—ছুরি দিয়ে খোঁচানোর ব্যথা। সেইসাথে সর্বক্ষণ গা-বমি-বমি। লাশকাটা ডাক্তার এন্টোমারসিও রায় দিল—হেপাটাইটিস। আগে থেকে রোগের নামটা বোধহয় জানা ছিল। যাই হোক, চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। নেপোলিয়নকে নাকি প্রচুর ব্যায়াম করতে হবে, আর সেইসাথে সমানে বিরেচক ওষুধ খেতে হবে—তবে এ রোগ জব্দ হবে।

জব্দ হওয়া তো দূরে থাক, রোগের প্রকোপ আরো বেড়ে গেল। নেপোলিয়নের অমন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। ওজন কমে গেল। রোগশয্যায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল সে। বড় একা, কাছে স্ত্রী নেই, ছেলে নেই।

১৮২১ সালের জানুয়ারি মাস। অসুস্থতা বেড়ে যাচ্ছে নেপোলিয়নের। ভীষণ বমি হচ্ছে। কিছু খেলে পেটে থাকে না। পেটের ডান দিকে অসহ্য ব্যথা। স্যুপ, বার্লি আর তার সাথে একটু জেলি, এই হল নেপোলিয়নের বর্তমান খাবারের মেনু। শীর্ণতার ছাপ পড়ল তার চেহারায়।

১৭ মার্চ। সামান্য সুস্থ বোধ করে একটু বাইরে বেড়াতে গেল নেপোলিয়ন। এই তার শেষ বেড়িয়ে আসা। সামান্য বেড়ানোটুকুও এই শরীরে সহ্য হল না। বাড়ি ফিরেই বিছানা নিল। অবিরাম বমি করে প্রায় মুমূর্ষু হয়ে পড়ল। ডাক্তার এন্টামারসিও এসে পরীক্ষা করে মাথা নাড়ল। গ্যাসট্রাইটিজ—অর্থাৎ অন্ত্রের প্রদাহ। ডাক্তার যখন, তখন ওষুধ নিশ্চয়ই দেবে। ওষুধ অবশ্য এই রকম, সেই বিরেচক। এবার একটু বেশি জোরালো।

এর পরের অবস্থা অবর্ণনীয়। তীব্র যন্ত্রণায় ঘরের মেঝেতে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল নেপোলিয়ন। মনে হল, অন্ত্রের ভেতরটা কে যেন ক্ষুর দিয়ে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটছে। এন্টামারসিও প্রকৃত রোগটা ধরতে না পারলেও নেপোলিয়ন কিন্তু ঠিকই বুঝেছিল—আসলে তার যা হয়েছে, তার নাম ক্যান্সার, স্টমাক ক্যান্সার। তার বাবা চার্লস বোনাপার্টও মারা গেছে ওই একই রোগে।

রোগশয্যা যে মৃত্যুশয্যা হতে যাচ্ছে, এটা বোধহয় নেপোলিয়নের মনে জেগেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল, পা-পা করে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। তাই কয়েকবার বলেছিল, 'মৃত্যু আছেই, মরণে আমি ভয় পাই না। মনে শুধু আশঙ্কা, মৃত্যুর পর ইংরেজরা আমার দেহটা নিয়ে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে একটা প্রদর্শনী না দেয়, আর বলে, দেখ, আমাদের যুদ্ধজয়ের পুরস্কার।'

ক্রমে একটা হিমশীতলতা নেমে এল লং উডের জীর্ণ গায়ে। কেউ জোরে কথা বলে না, কেউ হাসে না। কান্নায় ভরা বুক চেপে চলাফেরা করছে নেপোলিয়নের সঙ্গীসাথী, তার পরিচারক-সেবকরা।

১৩ এপ্রিল, ১৮২১। উইল করল নেপোলিয়ন। প্রথমটা নিজের হাতে লেখার চেষ্টা করল, পারল না। তারপর মুখে বলে গেল, 'ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী পরিবারে আমার জন্ম হয়েছিল। সেই বিশ্বাস নিয়েই আমি যাচ্ছি। মৃত্যুর পর আমাকে যেন ফরাসিদের মধ্যে সীম নদীর ধারে সমাধিস্থ করা হয়... ।' উইলের মধ্যে নেপোলিয়ন ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, তার প্রিয়তমা স্ত্রী মারি লুইজা যেন ছেলের সবকিছু দেখাশোনা করে। ছেলে যেন বাপের মতোই বলতে শেখে—সবকিছুই ফরাসিদের জন্য। নেপোলিয়ন শ্রদ্ধা জানাল মা ল্যাটিজিয়াকে, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাল পরিবারের আর সবাইকে। শত্রু, বিরোধী—সবাইকে ক্ষমা করে দিল।

একটা ফরাসি ব্যাংকে তার ব্যক্তিগত সঞ্চয় জমা ছিল—সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ। ছেলেকে কিছু টাকা দিল সে। এছাড়া দিল নিজের ব্যবহৃত অস্ত্র, ঘোড়ার জিন, রেকাব, পোশাক ও অসংখ্য বই। সঙ্গী মানথোলনকে দিল কুড়ি লক্ষ ফ্রাঁ। বারট্রান্ডকে পাঁচ লক্ষ এবং ভৃত্য মারচ্যান্ডকে দিল চার লক্ষ। অন্যান্য পরিচারকদেরও কিছু কিছু দিল। শেষের দিনে বড় বিশ্বস্ত সঙ্গী ওরা, ওদের না দিলে হয়! দিতে তো ইচ্ছে করে আরো অনেককে—যারা সহকর্মী ছিল, সেনাপতি ছিল, যারা সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করেছে, যারা নেপোলিয়নের সুখে হেসেছে, তার ব্যথায়

সমব্যথী হয়েছে। উইলের শেষ কটা পাতায় কেবল এদের নাম, এদের কাজের উল্লেখ। নেপোলিয়ন প্রতিজনকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছে মৃত্যুকালীন এই অভাবনীয় উইলে।

বিপ্লবের সন্তান নেপোলিয়ন, ভলটেয়ার–রুশোর শিষ্য নেপোলিয়ন কখনো তথাকথিত ধর্মনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় নি। ধর্মে বিশ্বাস করে নি। কিন্তু অকূল সাগরের মাঝখানে এই রুক্ষ দ্বীপে লং উডের বাড়িতে কিছুদিন বাস করার পর সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিল, বিশ্বাস করেছিল জন্মান্তরবাদে। হয়তো নিজের গোটা জীবনটাকে ব্যাখ্যা করে, বিশ্লেষণ করে এই বিশ্বাসই হয়েছিল যে, মানুষ যত বড়ই হোক, যতই আস্ফালন করুক, আর বিজয়দম্ভে যতই সে মেদিনী কাঁপিয়ে দিক, সবার ওপরে সত্য একমাত্র নেমেসিস—নিয়তি, যে–কোনো এক অদেখা–অচেনা ঈশ্বরের বিধানে চলে। নইলে নেপোলিয়নের শেষ কটা বছর এমনভাবে কাটবে কেন? কেন তার অন্তিম মুহূর্তের এমন ইতিহাস তৈরি হবে?

ধর্মযাজক ডেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে পালন করতে হবে তার নির্দেশ দিল নেপোলিয়ন 'আমি ক্যাথলিক, অতি বিশ্বস্ত ক্যাথলিক খ্রিস্টান। আমার মৃত্যুকালীন অনুষ্ঠানে যেন কিছু ফাঁক না থাকে।'

মানথোলনকে ডেকে তাকে দিয়ে একটা চিঠি মুসাবিদা করে দিল। তার মৃত্যুর পর ঠিক এই ভাষাতেই একটা চিঠি পাঠানো হয় হাডসন লো–কে। 'গভর্নর বাহাদুর, অনেকদিন অতি কষ্টকর অসুস্থতা ভোগ করে... তারিখে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সম্রাটের আদেশে আমি আপনাকে এই সংবাদ দিচ্ছি এবং একই সাথে তার শেষ ইচ্ছাও আপনাকে জ্ঞাপন করছি... ।' কেবল তারিখটা বসানো বাকি রইল, আর কিছু না। নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে রেখে গেল নেপোলিয়ন।

ক্রমশ আরো ভয়ঙ্কর হল রোগ। নেপোলিয়নের সত্যিই ক্যানসার হয়েছিল। একে তো দুর্দমনীয় ব্যথা, তার ওপর অবিরত বমি। কণামাত্র খাবারও পেটে রাখতে পারছিল না। অথচ খিদের প্রচণ্ড অনুভূতি।

শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে লাগল নেপোলিয়ন। শেষশয্যায় শুয়েও ভাবত, একটু বেশি বেশি খেয়ে শরীরে কি আবার শক্তি ফিরিয়ে আনা যায় না? জীবন, সেই আগেকার কর্মবহুল, উদ্দীপ্ত জীবন... সে কি আর ফিরে আসবে না? কিছুই ফিরে এল না, বরং কত কী হারিয়ে গেল, চলে গেল, ঝরে পড়ল...

শেষের কটা দিন বড় শীত করত নেপোলিয়নের। পা দুটো যেন ঠাণ্ডায় জমে যেত। নেপোলিয়ন শুধু ভাবত, কেন এত ঠাণ্ডা! সূর্যের তাপ কি নিভে গেছে? কিছুদিন আগেও তো সে ভোরবেলা উঠে পুবদিকের জানালা খুলে উদীয়মান সূর্যকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে, 'সুপ্রভাত বন্ধু, আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।'

সেই উষ্ণহৃদয় বন্ধু কি নিভে গেছে? তার তাপেই তো নেপোলিয়ন আবার উত্তপ্ত হবে, আবার উদ্দীপ্ত হবে।

২৬ এপ্রিল। ভোরবেলা মানথোলনকে কাছে ডাকল নেপোলিয়ন। ফিসফিস করে বলল, 'জান, জোসেফাইন এসেছিল.....।'

'জোসেফাইন এসেছিল?' মানথোলনের কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ, তখনো ভোর হয় নি। চুপিচুপি জোসেফাইন এল। আমাকে বলল, আবার আমাদের দেখা হবে। আমরা আর কখনো কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না।' খুশির আমেজে

মুহূর্তের জন্য ঝলমলিয়ে উঠল নেপোলিয়নের শীর্ণ মুখটা। বুঝতে পারল মানথোলন, বেশি দেরি নেই আর। ডাক এসে গেছে ওপারের।

২৭ এপ্রিল। বীভৎস বমি করল নেপোলিয়ন। কফির তলানির মতো গাঢ় রং। সন্দেহ হল পাকস্থলীতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে বমির ওই রং। ছটফট করতে লাগল নেপোলিয়ন। 'বাতাস—একটু বাতাস চাই। এতটুকু বাতাস নেই এই ঘরে। আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে চল।'

পরদিন সবাই ধরাধরি করে বসার ঘরে নিয়ে গেল নেপোলিয়নকে। ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে এল সে।

২৯ এপ্রিল। আরো বেড়ে গেল বমির ভয়াবহতা।. সেদিন আটবার বমি করল নেপোলিয়ন। সব যেন নিংড়ে বেরিয়ে গেল শরীর থেকে। বারবার পানি খেতে চাইল অবসন্ন, মুমূর্ষু নেপোলিয়ন। একটু কমলা ফুলের মধু দেওয়া হল। মুখ বিকৃত করল নেপোলিয়ন। ভালো লাগছে না। একটু কফি খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ। কফি কিছুতেই না।

'একটু দাও, এক চামচ...

সামান্য এক চামচ কফির জন্য নেপোলিয়নের আকুতিতে পানি এল বারট্র্যান্ডের চোখে। এই নাকি সেই শালপ্রাংশু সিংহবাহু নেপোলিয়ন!

'কী খাব, বাদামের শরবত, না লেমোনেড?' বাচ্চা ছেলের মতো বারট্র্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল নেপোলিয়ন।

'বাদামের শরবত একটু ভারি'। জবাব দিল বারট্র্যান্ড।

'লেমোনেড ভালো, তাই না?'

'হ্যাঁ... ।'

'চেরি ফল দিয়ে তৈরি কোনো পানীয় নেই?'

'হ্যাঁ, আছে... নেপোলিয়নের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে রুদ্ধ হয়ে আসে বারট্র্যাণ্ডের গলা। কী ব্যথা আর কী খিদে নেপোলিয়নের পেটে! তাই খাওয়া নিয়ে এত কৌতূহল, এত জিজ্ঞাসাবাদ।

'আচ্ছা, আপেলের কোনো পানীয় হয় না?'

'হয়.....

'নাশপাতি?'

'তাও হয়.....

'আর আখরোটের?'

'না, আখরোটের কোনো পানীয় হয় না।'

আবার জিজ্ঞেস করল নেপোলিয়ন, চেরি ফল দিয়ে কোনো পানীয় হয় কি না। কতবার যে সে এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করল, ঠিক নেই। কোন পানীয়টা ঠাণ্ডা, যা খেলে তার খিদে যাবে, জ্বালা যাবে।

৩ মে। আরো অবনতি হল নেপোলিয়নের অবস্থার। ডাক্তারের নির্দেশে মৃত্যুকালীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করল ধর্মযাজকরা 'হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি তোমার সেবকের মুক্তি দাও, যেমন দিয়েছিলে মিশরীয় রাজা ফারাওয়ের হাত থেকে মোজেসের আত্মার মুক্তি.... '

৪ মে। সকাল থেকে শুরু হল অঝোর ধারায় বৃষ্টি। তার সাথে উত্তাল ঝোড়ো হাওয়া। সমস্ত দিন বুকের উপর হাতদুটো জড়ো করে, নিথর হয়ে শুয়ে রইল নেপোলিয়ন। রাত থেকে শুরু হল আরেকটা উপসর্গ। প্রচণ্ড হিক্কা। সেই সাথে ভুল বকা। সবাই বুঝল, এখন শুধু অপেক্ষা করা, শুধু মুহূর্ত গোনা। ডাক এল বলে। নেপোলিয়ন দুবার জিজ্ঞেস করল, 'আমার ছেলের নাম কী?'

কাছ অপেক্ষমাণ ভৃত্য কান্না চেপে বলল, 'আপনার ছেলের নাম জুনিয়র নেপোলিয়ন।'

মাঝে মাঝে ভুল বকে যাচ্ছে নেপোলিয়ন। তারই মধ্যে মানথোলন একবার শুনল, নেপোলিয়ন বলছে, 'ফ্রান্স... সেনাবাহিনী... জোসেফাইন..... ' তারপরই অত্যন্ত ছটফট করে উঠল নেপোলিয়ন।

৫ মে। সকাল থেকে বড় শান্ত নেপোলিয়ন, বড় নীরব। প্রথম দিকে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছিল অতি ধীরে, অতি মৃদুভাবে। ক্রমে ম্লান হয়ে এল দিনের আলো। মানথোলন চিনির পানিতে স্পঞ্জ ডুবিয়ে বারবার ভিজিয়ে দিতে লাগল শুকনো ঠোঁট দুটো। একটু পর জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে লাগল নেপোলিয়ন। শুরু হল শ্বাসকষ্ট।

পাঁচটা একচল্লিশে সূর্য অস্ত গেল সেই দিন। দূর থেকে একবার কামানের শব্দ শোনা গেল। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল নেপোলিয়ন। আরো দু-তিন বার। তারপর আর না। আর কোনোদিনই নিশ্বাস ফেলবে না নেপোলিয়ন। তার চেয়ে-থাকা শান্ত, অপলক চোখ দুটো আস্তে করে বুজিয়ে দিল ডাক্তার এন্টোমারসিও। ঘড়ির কাঁটা অচল করে দিয়ে শেষ মুহূর্তটাকে ধরে রাখল।

সময়টা ছিল পাঁচটা ঊনপঞ্চাশ।

তারিখ—৫ মে, ১৮২১।

বয়স—বাহান্ন, তাও পুরো হয় নি।

সেদিনই খবর পেল হাডসন লো। এল পরদিন। খাটের ওপর শেষশয্যায় শায়িত তার চির-অবাধ্য বন্দি। বন্দি এখন নিস্তেজ—নিদ্রিত। এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে হাডসন, তবুও উত্তেজিত হচ্ছে না নেপোলিয়ন। হাডসনকে তাতিয়ে দিচ্ছে না। মাথা নত হল হাডসন লো-এর। আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ কর, বন্ধু। সেন্ট হেলেনার বড় উদ্ধত, বড় গর্বিত আপসহীন বন্দি...।